দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ২০ সংখ্যা ❖ ২ মার্চ ২০২৬

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

আন্তর্জাতিক

- ইরানের ওপর মার্কিন মদতে ইসরাইলের ব্যাপক বোমা বর্ষণ — মনিরুল হক — ৩
- বাংলাদেশে বামপন্থীদের প্রভাব কেন কমছে ? — শুভ বসু — ৩
- ‘জুলাই বিপ্লবী’দের কবলমুক্ত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি ফিরল স্বমহিমায় — মিলন দত্ত — ৫

দেশের খবর

- ভোটার তালিকার অসঙ্গতি ও পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংকট — সুকুমার মিত্র — ৬
- হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি — কমলেশ গুপ্ত — ৮
- ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিষয়ক ঘোষণা বিভ্রান্তিকর — সৌর বসু — ১১
- সাম্প্রতিক এআই সামিট ও বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি — শুভাশিস মজুমদার — ১২
- এসআইআর তালিকা গণতন্ত্রের উপর আঘাত; সিপিআই (এম এল) লিবারেশন — ১৩
- ইরানের উপর মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ — ১৪
- তিন রাজ্যে পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন — অমিতাভ সিংহ — ১৫

আপনজনের কথা

- একজন দীপক সহস্র দীপক জ্বালিয়ে দেন। — মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৫
- উমর আমাদের অনুপ্রেরণা : উমর আমাদের সাথে আছে — ১৭

বাংলা ভাষা ও ২১ শে ফেব্রুয়ারি

- বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির পথ পরিক্রমা — মজিবুর রহমান — ১৭
- একুশে ফেব্রুয়ারি সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালির ভাবনা — নীতীশ বিশ্বাস — ১৯
- ভাষা দিবস,বাংলা ,বাঙালি ও আমরা — খগেন্দ্রনাথ অধিকারী — ২২

স্মরণ

- মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর) (১৯৩৩-২০২৬) — ২৪

ধারাবাহিক

- জরুরি অবস্থা : ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধির বিপুলভাবে জয়লাভ — সুশান্ত দাসগুপ্ত — ২৫
- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মহাত্মা গান্ধি — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ২৬

নাগরিক স্মৃতিচারণা

- অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্পিকার সৈয়দ নওশের আলী — ২৮

বন্ধুতার পাতা — সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

সম্পাদকীয়

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিক অধিকার হরণ

গত নভেম্বর, ২০২৫ এ নির্ধারিত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র চারমাস আগে জ্ঞানেশকুমার, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেন ওই রাজ্যে ভোটার লিস্টের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) হবে। প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২ সাল) থেকে এখন পর্যন্ত ৮ বার ভোটার লিস্টের ইনটেনসিভ রিভিশন (IR) হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে দীর্ঘ সময় নিয়ে । অন্তত এক থেকে দুই বছর সময় নিয়ে IR হয়েছে। সংবিধানে গোটা রাজ্য জুড়ে SIR এর কোনও Provision নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় যেখানে অনেক মানুষ উপরোক্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সেখানে SIR হতে পারে। জ্ঞানেশ কুমার তাঁর সিদ্ধান্তে অনমনীয় থাকলেন। বিহারে SIR আর হল। ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গেল ।এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু, দলিত ও দরিদ্র মহিলা। বোঝা গেল SIR- এর উদ্দেশ্য কী। বিহারে নির্বাচনী প্রচারে মোদিজি ও অমিত শাহ বলে গেলেন রাহুল গান্ধি এস.আই.আর এর বিরোধী ।কারণ তিনি সমর্থন করেন ঘুষপ্যাটটিয়া (অনুপ্রবেশকারি)দের। যদিও কমিশন জানায় অনুপ্রবেশ বিষয়ে কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই ।

পশ্চিমবঙ্গের এস.আই.আর ঘোষিত হয় ২৭ অক্টোবর।৪ নভেম্বর এনুমারেশন শুরু হয় ।খসড়া তালিকা প্রকাশ হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫। এস.আই.আর- এর আগে ভোটার ছিলো ৭,৬৬,৩৭,৫২৯। নাম বাদ গেল ৫৮,২০,৮৯৯ জনের। এর মধ্যে আছে মৃত ভোটার,স্থান ত্যাগ, অন্য জায়গায় নাম, ফর্ম ৭ জমা করে ভোটারের নামে আপত্তি ইত্যাদি ।সংশোধনের পর ৭,০৮,১৬,৬৩০। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের পর ভোটারের সংখ্যা হল ৭,০৪,৫৯,২৮৪। রাজ্যের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মনোজ আগরওয়াল বলেছেন ফর্ম ৭ জমা দিয়ে আপত্তি করায় মোট নাম বাদ পড়েছে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার জনের । অথচ নির্বাচন কমিশন নিজেই গত ২০ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি - অভিযোগ পর্ব শেষ হবার পর বলেছিল , ফর্ম ৭ এর মাধ্যমে ৯৯ হাজার ১১৮ জনের নাম বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছিল। প্রশ্ন হল , যদি ৯৯ হাজার ১১৮ জনের নাম বাদ দেওয়ার দাবি ওঠে , সেক্ষেত্রে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার জনের নাম ফর্ম ৭ এর ভিত্তিতে বাদ গেল কী করে ? ফর্ম ৬, ৬ এ ' র মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন জমা পড়েছিল ৯ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশি । অথচ নতুন ভোটার হলেন মাত্র ১ লক্ষ ৮৪ হাজার । সংবাদে প্রকাশ অন্তত প্রায় ৮ লক্ষ নতুন আবেদনকারীর আবেদন গ্রাহ্য হলোনা। সেগুলি সি.ই.ও ' র দপ্তরে পড়ে আছে?

প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচন কমিশন হচ্ছে কমিশন অফ ডিলিশন , কমিশন অফ ইনক্লুশন নয় । আদতে এটি কোনও নির্বাচন কমিশনই নয়। এটি কার্যত শাসক দলের আজ্ঞাবহ দপ্তর । পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে কাহিনির এখানেই শেষ নয় । এইবার লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ওই ৭,০৪,৫৯,২৮৪ জনের মধ্যে আরও ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম শুনানি সাপেক্ষে বিচারাধীন (Adjudicated) রয়েছে । নানা হাস্যকর কারণে অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি Micro Observer রা AI এর সাহায্য নিয়ে ৬০ লাখ ভোটারকে বিচারাধীন করেছেন এবং স্পেশাল রোল অবজার্ভাররা তা অনুমোদন করেছেন। ব্যাপক হয়রানির জন্য রাজ্যে শতাধিক ব্লক লেভেল অফিসার ও সাধারণ মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বা অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন।

এখন সুপ্রিম কোর্ট ১৪২ ধারা প্রয়োগ করে এই ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারদের বিষয়টি পরীক্ষা করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন এর হাত থেকে নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের চিফ জাস্টিসকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ডিস্ট্রিক্ট জাজ , এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজদের নিয়োগ করে এই কাজ করাবেন। প্রয়োজনে অন্য রাজ্য থেকে বিচারক আনবেন। কিন্তু সময় অতি অল্প ।বহু মানুষ ভোট দিতে পারবেন বলে মনে হয় না ।

বহুদিন ধরেই বিজেপি বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান ও মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারিতে রাজ্য ভরে গিয়েছে বলে চেঁচামেচি করছিল। এইবার বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও শান্তনু ঠাকুর ক্রমাগত বলেছেন যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এই রাজ্যে আছে ও তাদের বাদ দিতে হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সি.ই.ও মনোজ আগরওয়ালকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন এই বাতিল ও বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে কতজন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারি ? তিনি বলেন, এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেখেন। এখন এই বিজেপি নেতারা বলা শুরু করেছেন যত মুসলমানের নাম বাদ যাবে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী। গতকাল বিজেপি' র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন কোচবিহারে বলেছেন যে ৬০ লক্ষ ভোটার বাদ গিয়েছে তারা সব অনুপ্রবেশকারী। লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিশাল সংখ্যক মানুষের নাম বিচারাধীন হয়ে গিয়েছে ।

যা হচ্ছে তা সঙ্ঘ পরিবার (অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি)- র রাজনৈতিক পথ। এরা সংবিধান রচনার সময় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল ।বলেছিল এসব হচ্ছে নেহরুর স্টান্টবাজি। আরএসএস প্রধান গোলওয়ালকর লিখেছিলেন : হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু মানুষদের দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে ।হয় তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে মেনে নেবেন,হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করবেন,হিন্দুকে মর্যাদা দেবেন ও শ্রদ্ধা করবেন, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির গরবকীর্তন ছাড়া অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না.....এক কথায় তাঁদের বিদেশি হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে ।অন্যথায় তাঁরা এদেশে থেকে যেতে পারেন,কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দুজাতির অধীন হয়ে ।কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি থাকবেনা তাঁদের, থাকবে না কোনও বিশেষ অধিকার ।কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা---এমনকী নাগরিক অধিকারও না(We– or Our Nation Defined – pp 55)। গোলওয়ালকরের উপরোক্ত চিন্তাধারাই এদের মূল চালিকাশক্তি ।

আন্তর্জাতিক

ইরানের ওপর মার্কিন মদতে ইসরাইলের ব্যাপক বোমা বর্ষণ : স্কুল ধ্বংস নিহত খোমেনি

মনিরুল হক

বেশ কিছুদিন ধরে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল যে, আমেরিকা এবং ইজরায়েল অচিরেই ইরান আক্রমণ করবে। বাস্তবে সেটাই ঘটল। গত শনিবার সকালের দিকেই আমেরিকা আকাশপথে তুমুল আক্রমণ নামিয়ে আনে ইরানের উপর। মানব সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের কতোটা ক্ষতি হয়েছে তা এখনই জানা সম্ভব না তবে একটি আক্রমণে যে ৫০ জনেরও বেশি স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে, এ তথ্য এখন আর গোপন নেই। আমেরিকা জানিয়েছিল পরিকল্পিত আক্রমণে আয়াতোল্লা খোমেনিও নিহত হয়েছেন।

ইরানের জাতীয় মিডিয়াও অবশেষে কনফার্ম করেছে যে খোমেনি নিহত হয়েছেন। ইরানের তরফে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ বহুদিন ধরেই ইরানী বিদ্রোহী জনতা, সংস্কৃতিকর্মীবৃন্দ, প্রগতিপন্থী ও মুক্তচিন্তকরা খোমেনির পতন চাইছিলেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে খোমেনিবাদের পতন হবে এমন আশা কেউ করছেন না। ইরানের জনগণের লড়াই বহুমাত্রিক। একদিকে তাঁদের লড়াই শাহতন্ত্র- খোমেনিতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অপরদিকে নেতানিয়াহু-ট্রাম্প চক্রের বিরুদ্ধে। দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে এক আধুনিক ইরা ন গড়ে তোলার জন্যও তাদের লড়াই বিদ্যমান আছে।

একমাত্রিক সীমিত চিন্তা দিয়ে ইরানের মুক্তিকামী জনতাকে বিশ্লেষন করলে ভুল হবে। কারণ শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, চেতনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতিগুলোর একটি হলো ইরান। তুদে পার্টি সহ ইরানের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পার্টিগুলোও খোমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, আবার তারা ইজরায়েল ও আমেরিকার আক্রমণের ও লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে।

খামেনির সাথে সাথে দ্রুত অন্ধকারময় ইসলামিক শাসনের পতন নিশ্চিত হল, এমন কথা বলা যায় না, কারণ খোমেনির পতন চাইলেও আমেরিকা খোমেনিবাদের পতন চায়, জোর দিয়ে এরকম কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। আমেরিকান বারুদের গন্ধ নয়, রং করা কোন পুতুল নয়, ইরানের মানুষের পছন্দ গণতন্ত্রের ক্ষমতায়ন। সবাই চাইবেন, ইরান যেন আমেরিকার দ্বিতীয় 'প্রজেক্ট বাংলাদেশ' না হয়।

বাংলাদেশে বামপন্থীদের প্রভাব কেন কমছে ?

শুভ বসু

বাংলাদেশে বামপন্থীরা কেন খুব একটা ভালো করতে পারেনি? অনেকেই এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে এবং একটি বিভ্রান্তিকর উত্তর দেয়। ইসলাম কমিউনিজমের সাথে ভালো যায় না। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধ ব্যক্তিরা এমন একটি ভাসাভাসা উত্তর দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এম এন রায় , বলেন চক্রবর্তী এবং অবনী মুখার্জি ছাড়া, বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় সকল সদস্যই ছিলেন মুসলমান। এর মধ্যে ছিলেন মুজাফফর আহমেদ, যিনি পরে কাকাবাবু নামে পরিচিত; কুতুবউদ্দিন আহমেদ; আব্দুল হালিম; আবদুর রেজ্জাক খান; এবং সম্ভবত আব্দুল মোমিন। 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' গানের প্রথম অনুবাদ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি মুজাফফর আহমেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই সকল নেতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার, শ্রমিক ও কৃষক দল প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে হিন্দু বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের কমিউনিজমের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৪০-এর দশকে, কমিউনিস্টরা কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিংবদন্তি ইতিহাসের অধ্যাপক সুশোভন সরকার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান প্রশ্নে মুসলিম লীগের সাথে একটি সমঝোতা করে এবং 'আজাদ হিন্দুস্তান মে আজাদ পাকিস্তান' স্লোগান উত্থাপন করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে, বিজয়ের স্থপতি আবুল হাশিম সমাজতন্ত্রের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম লীগের ইশতেহার তৈরি করেন। তার দুই ভাগ্নে, সহিদুল্লাহ এবং মনসুর হাবিবুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা ছিলেন। সামগ্রিকভাবে, প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন বেশ কয়েকজন উর্দু লেখককে আকৃষ্ট করেছিল, যার মধ্যে সাজ্জাদ জহির, কাইফে আজমি, ইসমত চুগতাই এবং সাদাত হোসেন মান্টো ছিলেন। পূর্ব বাংলায়, মনি সিং সুসং দুর্গাপুরে দলীয় সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধের পথিকৃৎ ছিলেন। দিনাজপুরে সুশীল সেন, বিভূতি গুহ , হাজী দানেশ এবং চিয়ারসাই শেখ তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলেন। বরিশালে মনোরোমা বসু এবং গোলাম কিবরিয়া কৃষকদের নেতৃত্ব দেন।

সিলেটে টঙ্ক আন্দোলনের সময়, সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। মজার বিষয় হলো, পূর্ববঙ্গে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট কর্মী হিন্দু থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই ছিলেন মুসলিম, যেমন আব্দুর রেজ্জাক খান ,আবদুল্লাহ রসুল, মুহাম্মদ ইসমাইল, মুহাম্মদ ইলিয়াস, মনসুর হাবিবুল্লাহ, সহিদুল্লাহ এবং আরও অনেকে। অবশ্যই, কিংবদন্তি কাকাবাবু ছিলেন অগ্রণী।

১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর, সিপিআই বি.টি. রনদিভের নেতৃত্বে একটি তাৎক্ষণিক বিপ্লব লাইন গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট কর্মীরা বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। এর ফলে মূলত দলিত আদিবাসী এবং পাহাড়িদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সাঁওতাল, গারো এবং নমশুদ্র জনগোষ্ঠী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। এটি ছিল একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। এই সময়েই ইলা মিত্রকে নাচোল থেকে বন্দী করা হয় এবং কারাগারে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। ১৯৫০ সালে, যখন বাংলার উভয় প্রান্তে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তখন প্রায় ১৫,০০০ কমিউনিস্ট কর্মী সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন, কারণ তাদের বেশিরভাগই হিন্দু ছিলেন। এর ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

দেশভাগের পর, দল সংগঠিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক মুসলিম কমিউনিস্টকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা পরে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন, যাদের মধ্যে মনসুর হাবিবুল্লাহও ছিলেন। তবে, হিন্দু কমিউনিস্টরা সেখানেই থেকে যান এবং মনি সিং এবং খোকা রায় তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেমন মোহাম্মদ ফরহাদ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা এবং পরে তরুণ বদরুদ্দিন ওমর। তারা একটি ছাত্র আন্দোলন এবং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। লেখকদের মধ্যে সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্ত বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। বাংলায়, মুসলমানদের মধ্যে কৃষক আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। মাওলানা ভাসানী সেই ঐতিহ্য থেকে এসেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একজন সহযাত্রী হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন ফ্রন্টাল পার্টির মাধ্যমে পরিচালিত হত, যার মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক দল, এবং পরে, ১৯৫৭ সালে, যখন ভাসানী ন্যাপ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দলটি ন্যাপের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনে জড়িত হয়।

এটি ছিল শীতল যুদ্ধের যুগ, এবং মাওলানা ভাসানী একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সুয়েজ যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদ (WPC) কর্তৃক আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি চীনে যান এবং মাও এবং ঝৌ-এর সাথে দেখা করেন। তিনি হাভানায় ত্রি-মহাদেশীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাওবাদীদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তোহা, কাজী জাফর, আলাউদ্দিন , রাশেদ খান মেনন , হায়দার আকবর খান রনো ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ শিষ্য। বৃহত্তম প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একটি, সংবাদ তখন বামপন্থী ছিল। ন্যাপ ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১৯৬৭-৬৮ সালে, দলটি বিভক্ত হয়ে যায় এবং তারপরে অতি-মার্কসবাদের ফলে তোহা ভাসানীর ইসলামী সমাজতন্ত্রের ধারণার কারণে ভাসানীর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তির ফলে শেখ মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে মূল স্রোতের রাজনীতিকে পরিচালিত করেন . মনি সিং, ফরহাদ এবং মুজাফফর আহমেদের মতো সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টদের একটি দল তার সাথেই ছিল। কিন্তু মাওবাদীরা বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিল। সিরাজ সিকদারের নিজস্ব একটি দল ছিল যারা আওয়ামী লীগের আগে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করেছিল। ইপিসিপি (এমএল) মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিরূপ ছিল। রাশেদ খান মেনন, কাজী জাফর এবং রনো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং শিবপুরে একটি মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

স্বাধীনতার পরে, চীন-সোভিয়েত সংঘাত চরমে পৌঁছানোর ফলে, মাওবাদীরা শেখ মুজিবের বিরোধী ছিলেন। মণি সিং, ফরহাদ এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে, তাজউদ্দিন এবং আবদুস সামাদ আজাদ সোভিয়েতপন্থী লাইন অনুসরণ করেছিলেন এবং সিপিবি এমনকি বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন, যা সিপিবির জন্য সম্পূর্ণ বিপর্যয়কর পদক্ষেপ ছিল। শেখ মুজিবের ছাত্র লীগের বৃহত্তর অংশ তাকে ত্যাগ করে জেএসডি গঠন করে, আরেকটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল, যেখান থেকে বিএসডির (বাংলদেশ সমাজতন্ত্রী দল) উদ্ভব হয়েছিল। জেনারেল জিয়া বিএনপি প্রতিষ্ঠা করার পর, অনেক প্রাক্তন মাওবাদী এবং ভাসানীর সমর্থকরা নতুন দলে যোগ দেন। তারা ভারতবিরোধী এবং চীনপন্থী ছিল। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় সিপিবি তার জনপ্রিয়তা ফিরে পায়। ১৯৯১ সালে, তারা আজকের এনসিপির মতো পাঁচটি আসন জিতেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, সিপিবি দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি উপদলে দল ভেঙে দেয় ।এর ফলে সিপিবি ভেঙে যায়। কাজী জাফর এবং হায়দার আকবর খান রনো একটি শ্রমিক দল (Workersó Party)গঠন করেন। তারা শেখ হাসিনার সাথে জোটবদ্ধ ছিলেন এবং রাশেদ খান মেনন কারাগারে আছেন। রনো পরে সিপিবিতে

ফিরে আসেন। জাসদ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ছিল হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে, যিনি আওয়ামী লীগের সাথেই ছিলেন এবং এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। জাসদের একটি শাখা বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী দল সক্রিয় ছিল।

সুতরাং, বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের পতন ধর্মের সাথে খুব একটা সম্পর্ক রাখেনি; বরং, এটি একটি ঐক্যফ্রন্ট এবং রাজনৈতিক কৌশলের উপর একমত হতে না পারার কারণেই হয়েছিল। নতুন প্রজন্ম তৃণমূল স্তর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করতে পারে যা বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামাতের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। আমি এটি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক।)

‘জুলাই বিপ্লবী’দের কবলমুক্ত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি ফিরল স্বমহিমায়

মিলন দত্ত

অনেকগুলি কারণেই এ বারের একুশে হয়ে উঠেছিল অনন্য। আওয়ামি লিগ এখনও নিষিদ্ধ হয়ে আছে। শেখ হাসিনা দেশের বাইরে। তার পরেও কিছু কর্মী গেরিলা কায়দায় শেখ হাসিনার নাম লেখা ফুলের স্তবক পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাদদেশে। বেশ কয়েক বার ‘জয় বাংলা’ স্লোগানও শোনা গিয়েছে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসা তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে। তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের পরে ড. ইউনুসের সরকারের আমলে গত বছর ঢাকার শহীদ মিনারে একুশে উদযাপন হয় কোনও রকমে। শহিদ মিনার আর তার আসপাশের রাস্তা জুড়ে যে রঙীন আলপনা আঁকা হয় শিল্পকলার ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে, গত বছর তার প্রায় কিছুই দেখা যায়নি। রাতভর বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তি মিছিল করে শহীদ মিনারে যান ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে, তার কিছুই প্রায় দেখা যায়নি গত বার। এ বার ফের একুশে উদযাপনের বিপুল আয়োজন।

একুশে ফেব্রুয়ারি রাতের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে কুটনীতিবিদ, আমলারা শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। রাত ১২টা ৭ মিনিটে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহিদদের স্মরণে বিশেষ দোয়ায় অংশ নেন তিনি, যা অভিনবও বটে। এর আগের দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া গত ৩৫ বছরে ভাষা শহিদদের স্মরণে কখনও ধর্মীয় আচারকে টেনে আনেননি। সবাইকে চমকে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দল হিসাবে জামায়েতে ইসলামের নেতৃত্বাধীন ১১ দলের জোটের নেতারা। এ বারে বিরোধীদের নেতৃত্বে ছিলেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। আবার ইসলামি ছাত্র শিবির নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতারাও ফুল হাতে এসেছিলেন শহিদ মিনারে।

ভাষা শহিদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর রীতিকে ইসলামি মতে বরাবর ‘ইসলাম-বিরোধী’ বলে এসেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া জামায়াত। শুক্রবার মধ্যরাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের আমির শফিকুর রহমানেরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন উত্তাল স্লোগান ওঠে, ‘একাত্তরের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘গণহত্যাকারী রাজাকারদের বাংলায় ঠাঁই নেই’।

আমির শফিকুরের দাবি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁকে শহিদ বেদিতে ফুল দিতে আসতে হয়েছে। আমির বলেন, ‘এটা রাষ্ট্রীয় আচারের অংশ’। অর্থাৎ আমিরের কথা অনুযায়ী, এখনও জামায়াত মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ভাষা আন্দোলন ভুলই ছিল, নেহাত রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁরা শহিদদের ফুল দিতে এসেছেন। এর আগে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে খালেদা জিয়া সরকারে মন্ত্রী ছিলেন দুই জামায়াত নেতা। তখন কিন্তু রাষ্ট্রীয় আচার পালন করতে তাঁদের শহিদ মিনারে দেখা যায়নি।

আমি গত বছর তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের পরে ‘নতুন’ এবং ‘স্বাধীন’ বাংলাদেশের একুশে উদযাপন দেখতে গিয়েছিলেম। সেই অভিজ্ঞতার এক টুকরো (‘নাগরিক’-এই প্রকাশিত) এখানে দিলামঙ্ক ত এর আগেও বার দুয়েক গেছি। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ তারিখ রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে যায় মিছিল করে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেওয়া। যে যার সাধ্য মতো ফুলের বিশাল বিশাল বোকে থেকে শুরু করে নিজের বাগানের একটা গোলাপ পর্যন্ত রেখে যান শহিদ মিনারে। হাজারে হাজারে মানুষ নিজ নিজ সংগঠন, সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টেল, ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্যনার নিয়ে মিছিল করে যেতে থাকেন শহিদ মিনারের দিকে ।মিছিলের মুখে মুখে থাকে একুশের গান। গোটা ঢাকা শহরের সেদিন অন্য এক রূপ। শহিদ মিনারের একেবারে পাদদেশ থেকে গোটা চত্বর ঢেকে যায় নানা রঙের ফুলে। বিশাল চত্বর জুড়ে কেবলই ফুল। স্বেচ্ছাসেবীরা হিমসিম খেতে থাকেন নতুন-আসা ফুলের জায়গা করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামান্যই ফুল এবার শহিদ মিনারে। মিছিলের সংখ্যা নেহাতই কম। গলায় নেই গান। যে চত্বরে ফুলের ভারে হাঁটার জায়গা থাকত না সেখানে নানা

কিসিমের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজনে ভর্তি। গান আছে কেবল মাইকে। একুশের ভোর পাঁচটা থেকে ঘণ্টা দুয়েক শহিদ মিনারে অবস্থান করে এবার আমার এই অভিজ্ঞতা।'

দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী, প্রতিবছর পয়লা ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে বইমেলা'র আয়োজন করে থাকে বাংলা একাডেমি। কিন্তু ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় বইমেলা দুই মাস এগিয়ে এনে গত ডিসেম্বরে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা একাডেমি। কিন্তু প্রকাশকদের একাংশ তখন তার বিরোধিতা করে। সেইসঙ্গে, ত্রিশটির বেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে 'অতীতের রীতি মেনে ভাষার মাসে' বইমেলা আয়োজনের দাবি জানানো হয়। এই অবস্থায় ডিসেম্বরে মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায় কর্তৃপক্ষ। এরপর নির্বাচন ও সরকার গঠন শেষে মেলা শুরুর নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০ ফেব্রুয়ারি। ওই সময় রোজা শুরু হয়ে যাওয়ায় পাঠক-ক্রেতা না-পাওয়া এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির কথা ভেবে বইমেলা পিছিয়ে ঈদুল ফিতরের পরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় প্রকাশকদের বড় একটি অংশ। তাতে সাড়া না দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা জানায় বাংলা একাডেমি। কিন্তু একটি যৌথ বিবৃতি দিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত জানায় অন্যপ্রকাশ, বাতিঘর, ইউপিএল এবং পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সসহ ৩২১টি প্রকাশনা সংস্থা।

গত দেড় বছর ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মুখে বাংলাদেশে প্রকাশনা শিল্প এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। তারওপরে অমর একুশে বইমেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা। গত বছর একুশে বইমেলা নির্ধারিত একমাস ধরেই চলেছিল। কিন্তু দেশে রাজনৈতি অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার বেহাল অবস্থায় বই একেবারেই বিক্রি হয়নি। তাছাড়া একুশে বইমেলা ঘিরে আয়োজক বাংলা একাডেমির সঙ্গে প্রকাশকদের বিরোধ ও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। বিএনপি'র নতুন সরকার তা অবসানে পদক্ষেপ নেয়। শপথ গ্রহণের পরেরদিন উভয়পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয় যে, অতীতের রীতি মেনে ফেব্রুয়ারিতে তারা মেলা শুরু করতে চান। প্রকাশনা সংস্থাগুলোর স্টল ভাড়া মকুফের কথাও জানায় সরকার। সেইসঙ্গে, প্রকাশকদের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে মেলা শুরুর তারিখ পাঁচদিন পিছিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। সেই মতোই মেলা শুরু হয়েছে। মনে রখতে হবে, এমর একুশে বইমেলা ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দেশের খবর

ভোটার তালিকার অসঙ্গতি ও পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংকট

সুকুমার মিত্র

এসআইআরের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গতকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় বাদ গেছে ৬৩ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫২ জন ভোটারের নাম। পাশাপাশি তথ্যগত বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম তালিকায় উঠলেও তাঁদের নাম শুনানি সাপেক্ষে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এসব ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির শুনানি শেষে ভোটার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ধাপে ধাপে তাঁদের নাম তোলা হবে ভোটার তালিকায়। তবে এই ৬০ লাখ ভোটারের মধ্যে কতজন চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করবেন, সে ব্যাপারে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন ভোটারের তালিকা নিয়ে নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন। গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পায় প্রথম খসড়া ভোটার তালিকা। তাতে নাম ওঠে ৭ কোটি ৮ লাখ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। বাদ যায় ৫৮ লাখ ২০ হাজার ৮৯৯ জন ভোটারের নাম। এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সেই ভোটারের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭ কোটি ৪ লাখ ৫৯ হাজার ২৮৪। এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে শুনানি সাপেক্ষে বিবেচনাধীন ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জন। এই প্রায় ৬০ লাখ ভোটারের মধ্যে কতজন শুনানিতে টিকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আর এই সংখ্যার মধ্যেই উল্লেখিত ৬০ লাখ ভোটারের ভবিষ্যত শুনানির পরই সঠিকভাবে বলা সম্ভব। এবার নতুন ভোটার হয়েছেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৭ জন।

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ভোটার তালিকার অসঙ্গতি আজ রাজ্যের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ভোটাধিকার, আর সেই অধিকারই যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখন গোটা সাংবিধানিক কাঠামো কেঁপে ওঠে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বেশির ভাগই হলেন মুসলিম ভোটার- যারা এখানকার আদি বাসিন্দা। এই বাদ পড়া নামগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর গভীর ছায়া ফেলছে। ফলে এক বিশাল সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীর অনুপস্থিতিতে যদি ভোট হয় তবে তা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়।

এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষতির সম্ভাবনা, বিজেপির লাভ, মতুয়া ভোটারদের প্রভাব এবং আদালতের ভূমিকা আলাদা করে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নয়, বরং গণতন্ত্রের সততা ও ভবিষ্যৎ রক্ষার এক কঠিন পরীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার এই অসংগতি রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে আমূল বদলে দিতে পারে এবং ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় রচনা করতে পারে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রহিঙ্গা

বহুদিন ধরেই বিজেপি বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও মায়ানমার থেকে আগত রহিঙ্গাইতে রাজ্য ভরে গিয়েছে বলে চেঁচামেচি করছিল। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে অমিত শাহ ও মোদিজি রাজ্যে প্রচারে এসে বলতেন এই রাজ্যে ৩ কোটি উইপোকা ও ছারপোকা (পড়ুন অনুপ্রবেশকারী) আছে এবং তারা ক্ষমতায় এলে এদের রাজ্য থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন । নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ার পর তারা অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আর কোনও কথা বলেন নি । তখন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার ছিলো। ভারতের সাথে ওই সময় শেখ হাসিনার সুসম্পর্ক ছিল । কোনোদিন মোদি সরকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় শেখ হাসিনার কাছে অনুপ্রবেশ সমস্যার কথা উত্থাপন করেননি । এইবার ২০২৬ এর নির্বাচনের ১ বছর আগে থেকে অনুপ্রবেশের বিষয় নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করা হয় । বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও শান্তনু ঠাকুর ক্রমাগত বলেছেন যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এই রাজ্যে আছে ও তাদের বাদ দিতে হবে । গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার মনোজ আগরওয়ালকে তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করা হয় এই ১ কোটি ২৫ লক্ষ বাতিল ভোটার ও পরীক্ষাধীন ভোটার এর মধ্যে কতজন রহিঙ্গা আছে ? এর উত্তরে শ্রী আগরওয়াল বলেন রহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না । কারণ এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেখেন। এখন এই বিজেপি নেতারা বলা শুরু করেছেন যত মুসলমানের নাম বাদ যাবে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী ।

তৃণমূলের ক্ষতির সম্ভাবনা

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি মূলত গ্রামীণ মুসলিম-প্রধান এলাকায় , গ্রামের দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ , মহিলা এবং শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে। কিন্তু ভোটার তালিকার এই ব্যাপক বাদ পড়া নাম সরাসরি তাদের ভোটব্যাঙ্ককে আঘাত করছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে কয়েক লক্ষ মুসলিম ভোটার বাদ পড়েছে। এই অঞ্চলগুলোতে তৃণমূলের শক্তি ঐতিহাসিকভাবে দৃঢ় ছিল। কলকাতার ভবানীপুরে ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫৯ লক্ষে, যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিজস্ব আসন। এটি রাজনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বীরভূমে সংখ্যালঘু ভোটার বাদ পড়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হতে পারে। ঘনিষ্ঠ মার্জিনের আসনে (১ হাজার থেকে ১০ হাজার ভোট) এই বাদ পড়া নামগুলো ফলাফল উলটে দিতে সক্ষম।

অতএব, তৃণমূলের ক্ষতির সম্ভাবনা শুধু সংখ্যাগত নয়, বরং তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপর সরাসরি আঘাত বলে মনে করি। বিজেপির লাভ অন্যদিকে বিজেপি এই পরিস্থিতিকে 'ভুয়া ভোটার পরিষ্কার' বলে প্রচার করছে। নন্দীগ্রামে ভোটার সংখ্যা সামান্য বেড়েছে, যা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র। মুসলিম ভোটার বাদ পড়ায় হিন্দু ভোটারদের অনুপাত বেড়ে যাচ্ছে, যা বিজেপির পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ বিজেপি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতিকে ভর করেই এবার পশ্চিমবঙ্গ দখলের স্বপ্ন দেখছে। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে, ভোটার তালিকায় ভুয়া নাম রয়েছে। এই বাদ পড়া নামগুলোকে তারা তাদের দাবির প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। ৭০টিরও বেশি মুসলিম-প্রধান আসনে তৃণমূল দুর্বল হলে বিজেপি সরাসরি লাভবান হবে। অতএব, ভোটার তালিকার এই পরিবর্তন বিজেপির জন্য রাজনৈতিকভাবে এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করছে এমনটা আশংকা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মতুয়া ভোটারদের প্রভাব

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মতুয়া সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সীমান্তবর্তী নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাদের ভোট সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) ইস্যুতে মতুয়া ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। সেক্ষেতত্রে নির্বাচনে বিগত দিনে সুফলও পেয়েছে।

কিন্তু ভোটার তালিকার অসঙ্গতি তাদের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। অনেক মতুয়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে বিজেপির কৌশল আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার তৃণমূলও এই বাদ পড়া নামগুলোকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পেলেও পেতে পারে। তাহলে মতুয়া ভোটারদের প্রভাব আসন্ন নির্বাচনে ভারসাম্য বদলে দিতে পারে।

মুর্শিদাবাদের মুসলিম ভোটার বাদ পড়া

মুর্শিদাবাদে বাদ পড়েছে ৪ লক্ষেরও বেশি মুসলিম ভোটার। এই জেলা ঐতিহাসিকভাবে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। মুসলিম ভোটারদের বাদ পড়া সরাসরি শাসক তৃণমূলের ক্ষতি। বিজেপি এখানে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও ভোটার তালিকার এই পরিবর্তন তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করছে। মালদা ও উত্তর দিনাজপুরেও একই চিত্র। মুসলিম ভোটার বাদ পড়ায় তৃণমূলের শক্তি দুর্বল হচ্ছে। এই বাদ পড়া নামগুলো যদি তালিকায় পুনর্বহাল না হয়, তবে নির্বাচনের ফলাফল নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে পারে।

ভবানীপুরে তৃণমূলের ক্ষতি

কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫৯ লক্ষে। এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব আসন। ভোটার সংখ্যা কমে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অবশ্যই বড় ধাক্কা। তৃণমূলের জন্য এটি শুধু একটি আসনের ক্ষতি নয়, বরং তাদের নেতৃত্বের মর্যাদার উপরও আঘাত হানার ইংগিত দিচ্ছে বিজেপি।

বিজেপি এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করছে। তারা দাবি করছে যে, ভোটার তালিকা থেকে ভুয়া নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু তৃণমূল বলছে, প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বিতর্ক ভবানীপুর কেন্দ্র আসন্ন নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত আসনে পরিণত হয়েছে।

আদালতের হস্তক্ষেপ

সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের এস.আই.আর প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করেছে। আদালত বুঝতে পারছে যে, এস আই আর প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও সময় প্রয়োজন। আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া এই নির্বাচন গণতন্ত্র সম্মত হতে পারে না। আদালত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে যে, ভোটার তালিকার অসঙ্গতি দূর না হলে নির্বাচন সাংবিধানিক সংকটে পড়বে। অতএব, আদালতের ভূমিকা শুধু বিচার নির্ভর নয়, বরং গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র ভরসা। কিন্তু বাস্তবে এই স্বল্প সময়ে সেই অ্যাডজুডিকেটেড বা বিবেচনাধীন প্রায় ৬০ লক্ষ । নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্ভুত সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব হবে? যদি না হয়, বিরাট সংখ্যক ভোটারকে এবারের নির্বাচনে ভোট দানে বিরত থাকতে হবে যা রাজনৈতিক বিন্যাসকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এদিকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে জোর বির্তক শুরু হয়েছে।

গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার এই বৈষম্য ও পক্ষগুপাতদুষ্টতা আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে শুধু একটি প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, বরং গণতন্ত্রের সততার উপর গভীর আঘাত। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এটি গণতন্ত্রের কালো অধ্যায় ও তাদের বড় ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করছে, বিজেপির জন্য রাজনৈতিক লাভের সুযোগ এনে দিচ্ছে, মতুয়া ভোটারদের প্রভাবকে অনিশ্চিত করছে এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের জন্য গণতন্ত্র রক্ষার এক কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে।

যদি ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার পর অ্যাডজুডিকেটেড বা বিবেচনাধীন ৫০,৬০ লক্ষ প্রকৃত ভোটার বাদ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে তা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। ভোটার তালিকা কেবল সংখ্যা নয়, বরং নাগরিকের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখন গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়ে যায়।

অতএব, আসন্ন নির্বাচনকে গণতন্ত্র সম্মত করতে হলে ২০২৪ সালের সর্বশেষ সংশোধিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা উচিত। এ ব্যাপারে আদালতের বিচক্ষণ হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই পারে এই সংকট থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন তাই কেবল একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নয়, বরং ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আসলে ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল

কমলেশ গুপ্ত

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রায় বছর খানেক আগেই আবিষ্কার এবং ঘোষণা করেন যে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের গৌরব গগৈ পাকিস্তানের গুপ্তচর।গৌরব তাঁর বিদেশিনী পত্নীর মাধ্যমে এই গুপ্তচর বৃত্তিতে জড়িত।তিনি আরো ঘোষণা করে ছিলেন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবিষয়ে গঠন করা এস আই টির প্রতিবেদন সর্বজনীন করবেন। তারপরে জানালেন কিছু তদন্ত বাকি আছে ফেব্রুয়ারিতে জানাবেন।গত ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিশাল সাংবাদিক

সম্মেলনে দেশের বড়ো বড়ো সাংবাদিকদের ডেকে যা শোনালেন, সামান্য বুদ্ধি থাকা যে কোনও মানুষ নিমেষেই বুঝে নেবেন যে উত্থাপিত ভুরি ভুরি অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন,বিরাট ফাঁকি। শুধু হিমন্ত নন, তাঁর মন্ত্রিসভার এবং বিজেপি দলের কিছু সদস্য প্রচারের জাল বিস্তার করে গৌরবের পাকিস্তানী লিংক বিষয়টি প্রতিপন্ন করতে বিস্তর চেষ্টা চালালেন।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা RAW রাতদিন ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তানের গতিবিধি, বিশেষভাবে গুপ্তচর বিভাগের কাজ কর্মের ওপর নজর রাখে। এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা তাদের নজরে পড়েনি অথচ অসমের অতি তৎপর মুখ্যমন্ত্রী ধরে ফেললেন ? তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে সাড়ম্বরে এবং সগর্বে ঘোষণা করেন যে তদন্ত আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে। এক শতাংশ কাজ অসমের এস আই টি করেছে,বাকি নিরানব্বই শতাংশ কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করবে। অর্থাৎ এক শতাংশ তদন্তেই গৌরব গগৈ পাকিস্তানের গুপ্তচর সাব্যস্ত হলেন।দেশকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রক্ষা করলেন তেমনটাই বোঝাতে চাইলেন। তাঁর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর জন্য তাঁকে কম করে 'ভারতরত্ন দেওয়া যেতে পারে' এমন কটাক্ষ করেছেন বুদ্ধিজীবীরা। সচেতন মহলে এ প্রশ্ন উঠেছে গৌরব গগৈ যদি পাকিস্তানের এজেন্ট বা দেশদ্রোহী,তবে কি করে লোকসভায় বিরোধী দলপতি হলেন ? মুখ্যমন্ত্রী যেসব তথ্য সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন তা আট মাস আগে কেন জানালেন না ? নির্বাচনের কাজে লাগবে বলেই কি ? লিড পাকিস্তান বা লিড ইণ্ডিয়া অর্থাৎ গৌরব গগৈর পত্নী যেখানে কাজ করতেন সেই 'লিডারশিপ পর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট' নামের ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থার তথ্য -পাতি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রনালয়ের হাতে ছিল না নাকি অসম সরকারের দ্বারা গঠিত এস আই টি প্রথম আবিষ্কার বা উদ্ধার করল ? কেন তবে গুজরাটে মোদী সরকার এই সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে ছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেননি। সচেতন মহলে এ প্রশ্নেরও উত্তর চাইছেন, নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে গগৈকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

--- দুই ---

অসমের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে যে বক্তব্য রেখেছেন তা শুধু অসংযত, বিপজ্জনক বা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোই নয়, প্রচলিত আইন কানুন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং সংবিধানের ওপর আক্রমণও বটে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে 'মিয়া' অভিধায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বাঙালি মুসলমান লোকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি স্থানীয় অসমিয়া মুসলমানদেরও 'সন্দেহযুক্ত নাগরিক' 'অপরিচিত মানুষ' ইত্যাদি বলা হচ্ছে। অসমিয়া মানুষের জাতীয় আবেগকে মূলধন করে অসমে 'মিয়া-বাংলাদেশী'র নামে একধরণের ন্যারেটিভ সৃষ্টি করতে চাইছেন তিনি। বিড়ম্বনার কথা হচ্ছে অসম চুক্তির স্বাক্ষরকারী দলের সাথে বিগত দশবছর শাসনে থাকার পর বিজেপি- আর এস এস বিদেশী সমস্যাকে আরো জটিল করেছে সি এ এ প্রণয়ন করে। বিদেশী বিতাড়ণ এখন হুংকারেই সীমাবদ্ধ হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে অসমে বসবাস করা পূর্ব বঙ্গ থেকে আসা বাঙালি মুসলমান যাদের 'মিয়া' বলে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে,তারা অসমে অসমিয়া মাধ্যমের স্কুল স্থাপন করে অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাদেরই 'অপরিচিত মানুষ' বলছেন।অথচ সি এ এ করে ২০২৪ সালেও যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের আপন করে নিচ্ছেন। এ যুক্তি অসমের সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছেন না

মুখ্যমন্ত্রী নিদান দিচ্ছেন 'মিয়া রিক্সাওয়ালা' যদি পাঁচ টাকা ভাড়া চায় তাকে চার টাকা দেবে। 'মিয়া' ভোটারদের বিরুদ্ধে সাত নম্বর ফর্ম পূরণ করে আপত্তি দর্শানোর জন্য আমিই বলেছি। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে 'মিয়া'রা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।এসব মন্তব্যের পর সর্বশেষ ঘৃণা ছড়ানোর উপকরণ হচ্ছে বিজেপির আই.টি সেলের প্রচারিত সেই বহু চর্চিত ছবি যাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুসলমানদের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছেন।

এই সবের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল , নাগরিক সমাজ সরব হয়েছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টেও মামলা হয়েছে। নির্বাচনের আগে তার নিস্পত্তি হবে বলে মনে হয়না। তবুও এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি ছিল।

---তিন ---

মুখ্যমন্ত্রী নিজের পদের মর্যাদা ভুলে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করেছেন অসমে ভোটার তালিকা সংশোধনে (SR) বিজেপি কর্মীদের ৭ নং ফর্ম দাখিল করে 'মিয়া' মুসলমান ভোটারদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে তিনিই বলেছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের মেরুদণ্ড স্বরূপ ভোটার তালিকাকে দলীয় স্বার্থে এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে বিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনেই ঘোষণা করছেন যে SIR এর সময়ে কম করে পাঁচ -ছয় লক্ষ ' মিয়া' ভোটারের নাম কাটা হবে। ভোটাধিকার

হরণের এমন হুঁশিয়ারি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি সরকার,প্রসাশন এবং নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা নয়, একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনের ফলাফল নিজের অনুকূলে সাজিয়ে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং বিজেপি এবং হিমন্ত বাহিনীর এক পরিকল্পিত কৌশল। বেকার সমস্যার তীব্রতা, মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ, কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, বর্বর উচ্ছেদ অভিযান, জনস্বাস্থ্য সেবার সংকট, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অবস্থা, কর্পোরেট গোষ্ঠীকে অসমের সম্পদ লুণ্ঠন এবং পরিবেশ ধ্বংস করার সুযোগ করে দেয়া এই সকল ক্ষেত্রেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার কলংকিত। অসমের পশ্চাৎপদ ছয় জনগোষ্ঠী তফশিল ভুক্ত করার নামে বারে বারে প্রবঞ্চনা-প্রতারণা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের উদগীরণ ঘটেছে।তাই জনসাধারণের দৃষ্টি মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে নিতে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টি এবং ভোটার তালিকাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আসলে হতাশার প্রতিফলন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জন বিক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। এই ক্ষোভের আঁচ পেয়ে এবং নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত মুখ্যমন্ত্রী দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরিয়া হয়েছেন।

---চার ---

বিধান সভা নির্বাচনের আগে আবার শুরু হয়েছে আয়ারাম গয়ারামের রাজনীতি। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ,সুবিধাবাদ,এম.এল.এ -মন্ত্রী হবার স্বপ্ন পূরণের স্বার্থে রাজনৈতিক নীতি আদর্শ ছেড়ে দলবদল শুরু করেছেন অনেকেই। অসমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি -নৈতিকতার অবক্ষয় এতটাই দ্রুত হতে শুরু হয়েছে যে এই গতিবেগ অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাতে বাধ্য হবেন।এই পতনোন্মুখ হরাজনীতির সূচনা নিশ্চয়ই একদিনে হয়নি। রাজ্যে নীতিহীন রাজনীতি কি রূপ নিয়েছে তা আমরা বেশ কিছু দিন থেকেই লক্ষ্য করছি। এই তো সেদিন হোটেলের কোঠায় বন্ধী করে রাখা বিরোধী দলের এম এল একে শাসক পক্ষের নেতা নিজে গাড়ি চালিয়ে এনে রাজ্যসভার নির্বাচনে শাসক পক্ষের হয়ে)ভোট ৮দিতে৮ বাধ্য করিয়ে ছিল । তখনই বোঝা গেছিলো যে রাজ্য রাজনীতি কি রূপ নিতে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতা এখন তীব্রতর হয়ে নতুন নতুন রূপ নিতে শুরু করেছে। দেখাযাচ্ছে ক্ষমতা দখলের কুটিল নীতিহীন কর্মকাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।হোটেল থেকে বন্ধী এম এল এদেরগ্ধ মুক্ত করে নেয়ার ঘটনা থেকে ভূপেন বরার বিজেপিতে যোগদানের ঘটনা কোন দিক দিয়েই পৃথক নয়। ভূপেন বরার কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসে ভাঙন ধরাবার প্রয়াস করা হয়েছে। ভূপেন বরার রাজ্যের সামাজিক জীবনেতো নয়ই কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাংগঠনিক ব্যবস্থায়ও কোন বিশেষ ভূমিকা বা অবদান লক্ষ্য করা যায় নি। তৎসত্ত্বেও ভূপেন বরার বিজেপি গমনের ঘটনাকে তিল কে তার করে শাসক বিজেপি প্রচার চালাচ্ছে।কারণ তিনি ছিলেন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। প্রাক্তন সভাপতির বিজেপি গমনের ঘটনা অতিরঞ্জিত করে জনসাধারণকে জানাতে থাকলে বিরোধী পক্ষ থেকে ভোটের যুদ্ধে এগিয়ে থাকাবে এই আশায়। এল অধঃপতিত রাজনীতিতে এ নতুন কথা নয়। অতীতেও হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু নেতাদের দল বদলে নিয়ে রাজনীতি যে নাগরিকদের নির্বাচনী ব্যবস্থা, গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি বিরাগ ভাজন করবে তাতে আর সন্দেহ কি! শুধু ভূপেন বরা নয়, নির্বাচনের আগে অন্তত আরো নয় জন জনপ্রতিনিধি নিজেদের দল ছেড়ে অন্য দলে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। বরাক উপত্যকার পাঁচ এম এল এ দল পাল্টাবেন । তাদের তিন জন এ ইউ ডি এফ দলের,দুজন কংগ্রেসের। এদের তিন জন যাবার কথা অগপতে আর দুজনের ঠিকানা হবে বিজেপি।ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চারজনই কংগ্রেসের।দুজন যাবে 'রাইজর দলে', একজন বিজেপি,একজন অগপতে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে , অসমের বিধানসভা সমষ্টি পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সীমা এবং জন বিন্যাস সচেতন ভাবে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পূর্বের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বসতি প্রধান সমষ্টি এখন অসমিয়া অথবা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আধিপত্যে পর্যবসিত হয়েছে। তাই দল পরিবর্তন করে এঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। আবারো জনপ্রতিনিধি হওয়ার লোভে নতুন সমীকরণের প্রেক্ষিতে এখন রাজনৈতিক আদর্শ এবং দল ছেড়ে পরিচয় পরিবর্তন করতে চাইছেন। কংগ্রেসে থাকার সময় ভূপেন বরা দীর্ঘ সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর পত্নী রিনিকি ভূঁঞা শর্মা এবং তাদের পরিবারের পর্বতপ্রমাণ সম্পত্তি এবং দুর্নীতির কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।অন্য জনপ্রতিনিধিরাও কম বেশি একই কাজ করেছেন। দল বদলের পর শাসক পক্ষ তাদের নিজের করে নিতে পারবে কি?

এবার কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত।

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ক যৌথ ঘোষণা বিভ্রান্তিকর

সৌর বসু

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত বাণিজ্যের জন্য একটি কাঠামো ঘোষণা করেছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা এবং পরে একটি দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য বিষয়ক একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছে। আমরা জানি কিছুদিন পূর্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে ।যদিও চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের কাজ এ বছরের শেষের দিকে সম্পন্ন হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটিকে বিশেষজ্ঞরা অসম চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মত অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর তাদের অসংবাদিত নির্ভরতা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত একজন দুর্নীতি পরায়ণ অস্থিরমস্তিষ্ক রাষ্ট্রপ্রধানের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার ফলে পৃথিবীর বাণিজ্যিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতার অর্থ বিপদকে আহবান করা।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর পক্ষ থেকে বাণিজ্য আলোচনা বিষয়ক যে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে তা নিম্ন রূপ

১) ভারত ৩০ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলারের মার্কিন বাজারে প্রবেশের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে।

২) বস্ত্র ও পোশাকের উপর শুল্কের হার ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে ।

৩) যন্ত্রপাতি রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক ১৮ শতাংশ কমানো হয়েছে। এছাড়াও ৪৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৪) মসলা চা কফি ফল বাদাম এবং কোন শুল্ক দেওয়া প্রয়োজন পড়বে না

৫) ডেয়ারী মসলা চা কফি ফল বাদাম প্রক্রিয়াজাত প্রভৃতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলি সুরক্ষিত রাখার কথা আলোচিত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ঘাটতি বিপুল পরিমাণ। ২০২৫ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ৫২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , ভারতে যত পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেছে, ভারত থেকে তার অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করেছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘাটতি ৫২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় অবিলম্বে এই বাণিজ্যিক ঘাটতি মিটিয়ে ফেলতে। শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয় সারা পৃথিবীজুড়ে যে সমস্ত দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে, অবিলম্বে তার অবসান ঘটাতে চায় ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই কারণেই শুল্কের হার নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মাতামাতি, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রভৃতি বর্বরোচিত আচরণ।

প্রকৃতপক্ষে এটি কোন চুক্তি নয়। সৌদি দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি ঘোষণা মাত্র। ২০২৫ সালে আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর একতরফা ভাবে শুল্ক বাড়িয়ে চলেছেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনকে কোনও তোয়াক্কা করছেন না। চুক্তি অনুযায়ী দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা করে শুল্ক নির্ধারিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি যেটা করছেন সম্পূর্ণ বেআইনি।

যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বাণিজ্য বিষয়ক ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন বাজারে , প্রবেশের অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কারণ ভারতীয় পণ্য রপ্তানির জন্য বিনা শুল্কের অথবা শুন্য শুল্কের অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশের অধিকার শুধুমাত্র ১০ বিলিয়ন পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্ধারিত আছে। কিন্তু এর বাইরে দুটি দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার মূলক যে প্রবেশের অধিকার তা কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে না। এছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত একজন অস্থিরমতি রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রতি মুহূর্তে তার সিদ্ধান্ত বদল করেন, অসত্য ভাষণে লিপ্ত থাকেন তার প্রতিশ্রুতি ওপর কোন ভরসা রাখা যায় না। যে সমস্ত পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক থেকে শুল্কের পরিমাণ ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে, এই পণ্য গুলি , মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম ফিলিপাইনস এর মতো দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবেনা। এই পণ্য গুলি হল টেক্সটাইল পোশাক চামড়া প্লাস্টিক রাবার প্রভৃতি। অন্যদিকে ভারত বিমানের যন্ত্রাংশ, রত্ন, জেনেরিক ফার্মাসিউটিকাস প্রভৃতি পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে আগ্রহী, এই পণ্য গুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না। অর্থাৎ পারস্পরিক শুল্ক ২৫ শতাংশ থাকবে।

কৃষি বিষয়ক ভারত মার্কিন যৌথ বিবৃতির ফলে ভারতের কৃষক গোষ্ঠী এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সমস্ত খাদ্য ও কৃষি পন্নের উপর ভারত ফুলকো রাজ করবে অথবা বাতিল করবে তার মধ্যে রয়েছে গাছের বাদাম প্রক্রিয়াজাত ফল সয়াবিন তেল পিডিট শুকনো ডিসটিলার শস্য , গবাদি পশুদের জন্য

কিছু খাদ্য। এই খাদ্যপণ্যগুলোর মধ্যে অনেকগুলি ভারতে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ভারতের কৃষি বাজার যদি আমেরিকার রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত করাা হয়, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২৫ সালে ভারতের উপর ট্রাম্প সরকারের ব্যাপক হারে শুল্ক আরপের পরেও, ভারতের রপ্তানি বিগত বছরের তুলনায় ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।। অর্থাৎ ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও অন্যান্য বাজারে তার রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছে তা সত্ত্বেও ভারত সরকার কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই একতরফা চুক্তি করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং কদম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক (খত্বন্তমনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের প্রশাসনিক অস্থিরতা, নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার, পররাষ্ট্রনীতির অস্বচ্ছতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখা ঝুঁকিপূর্ণ। ভারতকে বহুমুখী বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হবে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

এছাড়া মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী শুল্ক আরোপের ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেসের। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশেষ বাণিজ্য ক্ষমতা বলে শুল্ক কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ভবিষ্যতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। সে কারণে ভারতের উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিরেকে ব্রিকস দেশগুলির সঙ্গে(বিশেষ করে চীন রাশিয়া ব্রাজিল) এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংযোগ রাখা প্রয়োজনীয়।

সাম্প্রতিক এ আই সামিট ও বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি

শুভাশিস মজুমদার

সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আয়োজিত এ আই সামিট-টি চরম অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও জালিয়াতির এমন নিদর্শন হয়ে উঠলো যা শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, বিদেশেও ভারতের অসম্মান জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রথম দিন, অপরিকল্পিত ভাবেই প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ চলে আসেন এর উদ্বোধন করতে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারন দেখিয়ে সমস্ত প্যাভিলিয়ন খালি করে দেওয়া হয়। খালি ভারত মন্ডপমে (অনুষ্ঠান স্থলের নাম) চলে প্রধানমন্ত্রীর ফটো শ্যুট। অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের (ডেলিগেটস) এই ভাবে প্যাভিলিয়ন থেকে বের করে দেওয়া নিয়ে তৈরি হয় অসন্তোষ। একটি অংশগ্রহণকারী সংস্থা অভিযোগ করে, অসুরক্ষিত স্টল থেকে তাদের জিনিস চুরি হয়ে যায়। প্রথম দিনের এইরকম পরিস্থিতির জন্য মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং আশ্বস্ত করেন দ্বিতীয় দিন থেকে সমস্ত কিছু শান্তিপূর্ণভাবেই হবে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ আই সামিট নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের ৩-৪ কিঃমিঃ রাস্তা পায়ে হাঁটানো হয়েছে। গাড়ির চাবি, পেনড্রাইভ, ল্যাপটপ প্রভৃতি নিয়ে অতিথিদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। অনুষ্ঠান স্থলে ছিল না স্থির এবং শক্তিশালী ইন্টারনেট ব্যবস্থা, কিংবা অনলাইনে পেমেন্টের ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় দিন প্রকাশ পায় গালগোটিয়া ইউনিভার্সিটির জালিয়াতির খবর। ওই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নেহা সিং একটি আমদানি করা (ইম্পোর্টেড)চাইনিজ রোবোটকে (রোবো ডগ) নিজেদের ইউনিভার্সিটির তৈরি করা বলে দাবি করেন। শুধু তাই নয় কিছুক্ষণ বাদেই একটি ইম্পোর্টেড কোরিয়ান ড্রোনকে নিজেদের ইউনিভার্সিটিতে তৈরি ড্রোন বলেও তিনি প্রদর্শনীতে দেখান। এই জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস মিডিয়া এই সমস্ত খবর প্রকাশ করে। হাস্যকর ভাবে পরের দিন (সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে?) প্রফেসর নেহা সিং জোরের সঙ্গে দাবী করেন যে তাঁর কথা সংবাদ মাধ্যমের বুঝতে ভুল হয়েছে। কিন্তু সত্য প্রকাশ পাওয়ায় এবং নিন্দার ঝড় বয়ে যাওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে গালগোটিয়া ইউনিভার্সিটির স্টল বন্ধ করে দেয়া হয়, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঐ চাইনিজ রোবোডগকে নিয়ে গর্ব করে যে টুইট করেছিলেন তা' তিনি মুছে ফেলেন। ইউ টিউবের ছবিতে দেখা যায়, এই ইউনিভার্সিটি নিজেদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স বলে দাবি করছে, প্রধানমন্ত্রীর মিশন ও ভিশন অনুযায়ী আত্মনির্ভর ভারত - এর জন্যেই তারা কাজ করছে। এই ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সুনীল গালগোটিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বগুরু হওয়ার স্বপ্ন এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের (তাঁর রাজ্যকে জ্ঞান উৎকর্ষতার কেন্দ্রে পরিণত করার) স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্য নিয়েই এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুনীল গালগোটিয়াকে (যিনি ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলরের পদেও আছেন) স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। অথচ এই প্রদর্শনীতে তারা বিদেশি সামগ্রীর সঙ্গে রাবার ব্যান্ড লাগানো একটি

থার্মোকলের এরোপ্লেনকে প্রদর্শন করে, যা অত্যন্ত নিম্নমানের পরিচায়ক। এই ইউনিভার্সিটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই ইউনিভার্সিটি'র ছাত্রদের দ্বারা সরকারের পক্ষে এবং বিরোধী দল কংগ্রেসের বিপক্ষে সরাসরি প্রচার চালানোর প্রমাণ রয়েছে। ধর্মেন্দ্র কুমার নামে এই ইউনিভার্সিটি'র একজন রিসার্চ স্কলার একটি পেপার পাবলিশ করার চেষ্টা করেছিলেন যে কিভাবে থালি ও ঘণ্টা বাজিয়ে কম্পন সৃষ্টি করে করোনা ভাইরাসকে মেরে ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে চালানোর অপচেষ্টা।

অভিযোগ উঠছে, সরকারের প্রতি অন্ধ ভক্তির কারণেই সরকারের তরফ থেকে এই ইউনিভার্সিটিটির প্রদর্শিত মডেল গুলোর গুণগত মান বা সত্যাসত্যের কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। এই মোদী সরকারের আমলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি, ডিন, প্রফেসর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে আরএসএস ব্যাকগ্রাউন্ড এর মানুষদেরই নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পরিচালন দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ফলত, শিক্ষাগত মান নিম্নমুখী। বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে অনেক দূরে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের প্রচারই এখন প্রাধান্য পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ কেবলমাত্র ০.৬ শতাংশ অর্থ। এ আই সামিট হলেও, এ আই নিয়ে ভারতের কি রোড ম্যাপ আছে, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ আই নিয়ে আমেরিকা, চিন যে শক্তি প্রদর্শনী করছে তার মোকাবিলা ভারত কিভাবে করবে। কিভাবেই বা এই ক্ষেত্রে ভারত সম্প্রভুত্ব বজায় রাখবে। বিশেষত এ আই সামিটে উপস্থিত আমেরিকার হোয়াইট হাউজের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর নীতি উপদেষ্টা শ্রীরাম কৃষ্ণানের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'আমেরিকা চায় যে ভারত (এবং গোটা বিশ্বে) এ আই-তে কেবল আমেরিকান ফাউন্ডেশনাল মডেল (যা এ আই এর মূল ভিত্তি) ব্যবহৃত হোক।' দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রেও আমেরিকার সরাসরি দাদাগিরি। তাই ভারতের নিজস্ব এ আই ফাউন্ডেশনাল মডেল গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন সময়ে ভারতে এ আই - এর গুরুত্ব নিয়ে কথা বলে এসেছেন। সামাজিক মাধ্যমে উপলব্ধ একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ৪ জুন ২০২৩ এ রাহুল গান্ধি তথ্যের (ডেটা)গুরুত্ব (এবং তার নিরাপত্তা) সম্পর্কে অবগত করছেন। এ আই এর মডেল গড়ে তুলতে তথ্য (ডেটা), নেটওয়ার্ক, উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছেন। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩, রাহুল বলেন চাইনিজ ও আমেরিকান ডেটার পার্থক্য। প্রথমটি উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত, আর দ্বিতীয়টি বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার সম্পর্কিত।

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, রাহুল বলেন, এ আই এর প্রভাবে চাকরির ক্ষেত্রে কাজের ধরন বদলে যাবে।

২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, রাহুল সংসদে ভাষণে বলেন, এ আই এর ব্যবহার করে জাতি জনগণনার তথ্য সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক মোটরস, ব্যাটারি, অপটিক্স - এগুলোর উপর এ আই ব্যবহার করে ভারত সুদক্ষতা অর্জন করতে পারে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন ভারত এ আই - তে বিশ্বে এক নম্বর হবে। কিন্তু অন্তত উৎপাদন বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক তৈরি না হলে তা কখনোই সম্ভব নয়।

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, সংসদে ভাষণ দানকালীন রাহুল সতর্ক করেন, আমরা যদি ভবিষ্যতের কলা কৌশল (টেকনোলজি) ব্যবহার না করি তাহলে অবিলম্বে এ আই আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মহীন করে ফেলবে। রাহুল আরো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করেন যে ট্রেডডিলের নামে আমাদের ডিজিটাল ডেটা রুমের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য ভারত থেকে অনায়াসেই সমস্ত ডেটা ইউএসএ পেয়ে যাবে।

এ আই সামিটের পরিপ্রেক্ষিতে রাহুল অভিযোগ করেছেন, ভারতের ডেটা আমেরিকার কাছে তুলে দেওয়া হচ্ছে আর চাইনিজ রোবটকে আমাদের নিজেদের তৈরি বলে প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। এই সামিট চলার সময় যুব কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য তাদের শার্ট খুলে বিক্ষোভ দেখায়।তারা দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে বলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন। যুব কংগ্রেস বলে, তারা ভারত - মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি করে ভারতের কৃষকদের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে বলে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল। তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে ।এ আই সামিটের মাধ্যমে বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল হল, তা ভেবে দেখা দরকার।

এসআইআর তালিকা গণতন্ত্রের উপর আঘাত; সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি সিপিআই (এম এল) লিবারেশন এক বিবৃতিতে বলেছে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এসআইআর (SIR) তালিকা তাদের পূর্বঘোষিত আশঙ্কাকেই বাস্তবে প্রমাণ করেছে। তারা শুরু থেকেই

বলেছিল, এই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নয়; বরং বৃহৎ পরিসরে ভোটাধিকার সংকোচনের ঝুঁকি তৈরি করছে। প্রকাশিত তথ্য সেই আশঙ্কাকে আরও দৃঢ় করেছে।

আগে প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার পরও নতুন করে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ পড়াদের বড় অংশই গরিব, পরিযায়ী ও প্রান্তিক মানুষ। বহু ক্ষেত্রে জীবিত মানুষের নাম তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে নির্ধারিত শুনানিতে হাজির হয়ে নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম কেন বাদ গেল, তার কোনো স্পষ্ট কারণ জানানো হয়নি। এটি কেবল প্রশাসনিক ত্রুটি নয়; এটি সরাসরি নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত।

এর পাশাপাশি ৬০ লক্ষাধিক মানুষের নাম 'বিচারাধীন' রেখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক নাগরিক কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে। প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, এদের বড় অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বুথভিত্তিক তালিকা বিশ্লেষণ করলে হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে বাদ ও বিচারাধীন নামের অনুপাতের বৈষম্য স্পষ্ট। এতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা গুরুতর প্রশ্নের মুখে। লিবারেশন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে ;এটি কি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি-আরএসএসের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ? ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর এই অপচেষ্টা এক গভীর ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের দিকেই ইঙ্গিত করছে। শাসক দল ও নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশের অভিযোগ আজ আর জনমনে গুঞ্জন নয়, তা ক্রমশ প্রকাশ্য বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছে।

এত বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম অমীমাংসিত রেখে তালিকা প্রকাশ গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে প্রায় শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির নৈতিক ও প্রশাসনিক দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতেই হবে।

সমগ্র তালিকাই অসংখ্য ভুল ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। ত্রুটিমুক্ত তালিকার নামে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা বাস্তবে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর। কমিশনের পুরনো ভুলের খেসারত এবার বহু মানুষকে ভোটাধিকার হারিয়ে দিতে হয়েছে। আগামী দিনে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুলভ্রান্তির মূল্য জনগণকেই চুকাতে হবে।

এত মানুষের ভোটাধিকার যখন প্রশ্নের মুখে, তখন রাজ্য সরকারকে আরও দৃঢ় ও সদর্থক অবস্থান নিতে হবে। সংবিধান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়ানো তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও স্পষ্টভাবে জানাতে হবে;ত্রুটিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক তালিকার ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের অধিকার খর্ব হতে দেওয়া হবে না। শুধু প্রশাসনিক চিঠিপত্র নয়, কার্যকর রাজনৈতিক ও আইনি উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

ভোটাধিকার কোনো অনুগ্রহ নয়; এটি সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণপ্রতিবাদ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের সামনে আর কোনো পথ নেই। গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ইরানের উপর মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ২০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রামমোহন লাইব্রেরী হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথমেই এইদিন অতর্কিতে ইরানের উপর ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরুর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার অবনমনের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপক মনোজ গুহ এবং সমর্থন করেন শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার।

এস আই আর করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিকত্ব হরণ, আরাবল্লী পর্বতমালায় খননকার্য ও পরিবেশ ধ্বংস এবং বিচার ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অধ্যাপক প্রভাত দত্ত, অধ্যাপক দেবব্রত বেরা ও বরিষ্ঠ আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত। সভাপতির বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সভাপতি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী।

প্রারম্ভিক কথনে সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন মঞ্চের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারায় সংগঠন আগামীতেও বিবেকের ভূমিকা পালন করে যাবে এবং ২০ তম বছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ২০ টি সভা ও কর্মসূচি হবে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী অজয় চ্যাটার্জি।

সংবাদদাতা - আশিস বসু (২৮/০২/২৬)

তিন রাজ্যে পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন : ২ টিতে কংগ্রেস , ১ টিতে আপ এগিয়ে

অমিতাভ সিংহ

সম্প্রতি তেলেঙ্গানা রাজ্যে ১১৬ টি পৌরসভা ও সাতটি পৌরনিগমের নির্বাচন সম্পন্ন হল। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। বি.আর.এস (ভারত রাষ্ট্র সমিতি) ও বিজেপি পরাজিত হয়। তখন কংগ্রেসের ভোট শতাংশ ছিল ৩৯.৪%,বি.আর.এস- এর ৩৭.৩% ও বিজেপির ১৩.৯%। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এই তিনটি দলের ভোট শেয়ার ছিল যথাক্রমে ৪০.১%, ১৬.৬২% ও ৩৫.১৯%। পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট শতাংশ হল ৩৯.১০%, বিআরএসের ২৮.৮৬%ও বিজেপির ১৫.৬৮%।

মোট ২৯৯৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ১৫৩৭ টি ওয়ার্ডে। বিআরএসের ও বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে যথাক্রমে ৭৭২ ও ৩২৬ টি ওয়ার্ড। বিআরএস গত লোকসভা নির্বাচনে একটিও আসন না পাওয়া সত্ত্বেও পৌর নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করেছে বিজেপির তুলনায়।

সাতটি পৌরনিগমের পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস।দুটি পৌর নিগমের ফল ত্রিশঙ্কু অবস্থায়। আর পৌরসভার ১১৬ টির মধ্যে ৯৩ টিতে বোর্ড গঠন করতে চলেছে কংগ্রেস , ১৯ টিতে বিআরএস , ২ টি তে বিজেপি ও ১ টিতে সিপিআই বোর্ড গঠন করবে।

এই ফলাফল দেখলেই বোঝা যায় ঐ রাজ্যে রেবন্ত রেড্ডী সরকারের কাজকর্মে সেখানের মানুষ খুশী। তারা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটাও বোঝা গেল এখানে কংগ্রেসের প্রভাব বেড়েছে। যদিও বিআরএস তাদের প্রভাব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে। আর বিজেপি'র প্রভাব কমেছে।

এই বছরেই কেরালার বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে ঐরাজ্যে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল। মোট ৯৯১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস পরিচালিত ইউডিএফ জয়ী হয়েছে ৫০৫ টিতে , ৩৮.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে। এলডিএফ জিতেছে ৩৪০ টিতে ,ভোট শেয়ার ৩৩.৪৫%। এনডিএ পেয়েছে ১৪.৭১ শতাংশ ভোট ও জয় ২৬ টিতে । ১৫২ টি ব্লক পঞ্চায়েতের ইউডিএফ জয়ী হয়েছে ৭৯ টিতে ,এলডিএফ জয়ী হয়েছে ৬৩ টি তে। ১০ টিতে সমান সংখ্যক আসনে জয়ী হয়েছে দুটি দল অর্থাৎ টাই হয়েছে।

১৪ টি জেলা পঞ্চায়েতের উভয় দল সাতটি করে জেলাতে জয়ী হয়েছে। ৮৬ পৌরসভার ৫৪ টিতে জয়ী ইউডিএফ, ২৮ টিতে এলডিএফ ও এনডিএ ২ টিতে জয়ী হয়েছে।

৬ টি পৌরনিগমের চারটিতে জয়ী ইউডিএফ, একটি করে পৌরনিগমে জয়ী হয়েছে এলডিএফ ও এনডিএ। কান্নুর, কোচি, কোল্লামে ইউডিএফ বোর্ড গঠন করেছে। কোজিকোড়ে এলডিএফ ও তিরুবন্তপূরমে এনডিএ বা বিজেপি বোর্ড গঠন করেছে। তিরুবনন্তপূরমে গত ৪৫ বছর ক্ষমতায় ছিল বামেরা।

ওয়েলফেয়ার পার্টি,আম আদমী পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহন করলেও জনমানসে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ।

কিছুদিন আগে পাঞ্জাবের পৌর নিগম ও কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল। পাঁচটি মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ওয়ার্ডে আপ ৫১৫ টি,কংগ্রেস ১৮৭ টি ও বিজেপি ৬৮ টিতে জয়ী হয়েছিল।

৪১ টি পৌরনিগমের ৩৬৮ টি ওয়ার্ডে আপ ১৫৮ টি,কংগ্রেস ১২২ টি,বিজেপি ৬৮ টি,অন্যান্যরা ২২ টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

আপনজনের কথা

একজন দীপক সহস্র দীপক জ্বালিয়ে দেন

মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক এই সময়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে দেশের উত্তরভাগের স্থবির গোবলয়ে ফ্যাসিবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উপর হঠাৎ জ্বলে উঠেছেন মহম্মদ দীপক' যার আলোয় সব কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।। ঘৃণা, বিদ্বেষ, বুলডোজারে জর্জরিত ভারতের এই প্রান্তে হঠাৎ যেন নফরত মুছে গিয়ে মোহাব্বতের দোকান খুলে গেছে যা নিয়ে সমাজ মাধ্যম তোলপাড়। অনেকের মতে বোধহয় হিন্দুত্ব জঙ্গিপনার শেষের শুরু হল গোবলয়ে।

ঘটনা ঘটেছে অখ্যাত এক জনপদে যার নাম কোটদ্বার। উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়াল জেলার এই পৌরনগরটির অন্যতম খ্যাতি সিদ্ধবালী মন্দিরের জন্য, যেখানে হাজার হাজার মানুষ হনুমানজীর দর্শনে আসেন। মহম্মদ দীপক হিসাবে যিনি পরিচয় দিয়েছেন সেই ব্যায়ামাগার বা আধুনিক জবানে জিমের মালিক দীপক কুমারের জিমেও দেওয়াল জুড়ে হনুমানজীর ছবি। এই এলাকা আপাদমস্তক বিজেপি শাসিত। মেয়র, বিধায়ক, সাংসদ সবাই বিজেপির। জনসংখ্যায় হিন্দু ৯০ ভাগ আর তার পরেই মুসলমান ৯ ভাগ।

এহেন এলাকায় অদ্ভুতভাবে সাধারণতন্ত্র দিবসেই হনুমানজীর স্বঘোষিত ভক্তকুল অর্থাৎ বজরঙ্গ দলের সদস্যেরা সংবিধানকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সংখ্যালঘু অর্থাৎ ৯ শতাংশের এক প্রবীণ নাগরিককে উত্যক্ত করতে। তিন দশক ধরে বাজারে 'বাবা' স্কুল ড্রেসের দোকান চালাচ্ছেন ভকিল আহমেদ এবং সাথে তার ছেলে সোয়েব আহমেদ। এলাকার ছেলেমেয়েরা তাঁদের দোকানের পোশাক পরেই স্কুল পেরিয়েছে কিন্তু কিছুকাল থেকেই বজরঙ্গীদের ঘোর আপত্তি বাবা নামটিতে। মুসলমানের দোকানে বাবা নাম হবে কেন? 'বাবা' শব্দটি কবে থেকে বজরঙ্গীদের বাপের সম্পত্তি হয়েছে তা তারাই জানেন, মূলতঃ ফার্সী ভাষার এই শব্দটি জনক, সন্ত এবং আদরের শিশু সবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

ভকিল আহমেদ পারকিনসন্স অসুখে আক্রান্ত। তাঁর হাত পা কাঁপে। দীপক কুমার কাশ্যপ এবং তাঁর বন্ধু বিজয় রাওয়াত যখন দেখেন যে সত্তরোর্ধ্ব অসুস্থ ব্যক্তিকে একদল উত্যক্ত করছে, তাঁরা আপত্তি জানান। নিজেদের মহান কাজে এমন বাধা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বজরঙ্গিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তুই কে জাতীয় বাক্য নিক্ষেপ করে। যে উত্তরটি উঠে আসে তার অভিঘাতে এখন আসমুদ্রহিমাচল আলোড়িত। জিম ইনস্ট্রাকটার দীপক কুমার চোখে চোখ রেখে বলেন 'আমার নাম মহম্মদ দীপক'।

যে দিনটিতে এ দেশের জনসাধারণ নিজেদের সংবিধান নিজেদের দিয়েছেন, সেই দিনটিতেই এক সাধারণ নাগরিক উদ্যত ফ্যাসিবাদী হিংসার সামনে সংবিধানের মূল কথাটি তুলে ধরলেন। এই দেশ যে মহামিলন ক্ষেত্র, কর্পোরেট পুষ্ট সাম্প্রদায়িক সঙ্গীদের জমিদারি নয়, শুধু এই কথার জন্যই যেন মানুষের মন আকুল হয়েছিল। নাহলে কেনই বা অঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্রের মাটিতে মহম্মদ দীপকের পোস্ট পনেরো লক্ষ লাইক পায়। কেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বডিবিল্ডার ও জিমট্রেনারদের সংগঠন দীপকের পাশে দাঁড়ালেন! ভিডিও অতিদ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার পর কিছু সাধু সন্তও তাকে আশীর্বাদ করেছেন। উত্তরাখণ্ডের মহিলা মঞ্চের অধ্যক্ষ কমলা পন্ত তাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সরকারকে আবেদন করেছেন এভাবে মানুষকে উত্যক্ত করা যেন বন্ধ করা হয়। বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী দীপককে সাধুবাদ জানিয়ে তার কথা লেখায় আরো বেশি প্রচার হল। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমাজকর্মী লিখলেন 'আমার নাম মহম্মদ হিমাংশু সিংহ পিটার বৌদ্ধ'।

ফ্যাসিবাদী হিন্দু রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই একটু বিচলিত। যাদের ঘোষিত প্রকল্প মুসলমান নিগ্রহ, তারা তো এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য প্রশাসন নিজের কাজ করেছে। বজরঙ্গীদের বদলে দীপক এবং বিজয়ের বিরুদ্ধে শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা এবং আই আর নিয়েছে। এর দুদিন পর শদেড়েক জঙ্গী যখন দীপকের বাড়ি ঘেরাও করে, তখন বার বার ডাকা সত্বেও পুলিশ সময়মত পৌঁছায়নি। কিন্তু অতলে তলিয়ে থাকা গোদী মিডিয়ার বহু আগে পৌঁছে গেছেন স্বাধীন সাংবাদিক, ইউ টিউবার ইত্যাদি মাধ্যম। আয়ুষ চতুর্বেদীর মত তরুণের নেতৃত্বে পৌঁছেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তাঁকে সংবর্ধনা দিতে প্রস্তুত।ঞ্চ ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু দীপক বলেছেন এই টাকা দেওয়া হোক অঙ্কিতা ভান্ডারীর মত ঘটনায় নিপীড়িত মানুষদের।

কী এমন করলেন দীপক? এইটা বোঝার আগে উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতি দেখতে হবে। এই সেদিন দেওরা পাবলিক স্কুলে ফিল্মের গান বাজছিল ক্ষ্মতেরি হ্যায় জমিন তেরা আসমান, তু বড়া মেহেরবান।ক্ষ্ম গানটির একটি লাইন ছিল 'খুদা মেরে তু বখশিস কর্।' ব্যাস আর যায় কোথায়? বজরঙ্গিরা স্কুলে ঢুকে হাঙ্গামা শুরু করলো। শিক্ষক বোঝাতে চাইলেন রাম রহিম এক। তারা বললে রহিম শুনিনি। সে কে? শিক্ষক কবীরের কথা বললেন, উত্তরভারতের বিখ্যাত সন্ত, কিন্তু তারা বললো কে কবীর জানি না। ইস্কুলে মুসলিম গান চলবে না। ধর্মান্তকরণ চলবেন না। উল্লেখ্য যে উত্তরাখণ্ডের ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইনের প্রয়োগে বহু নবদম্পতির জেল হয়েছে। সেইখানে দীপক হলেন 'মহম্মদ দীপক'!

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা লখপত সিং ভান্ডারী দীপককে বোঝাতে যাবেন বলছেন। তাঁর মতে দীপক ভুল বুঝছেন, তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে, ইদানিং তিনি কার সাথে মেলামেশা করছেন জানা দরকার ইত্যাদি। কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন বাঁধ ভাঙছে। মানুষ ভয় মুক্ত হচ্ছেন। এই সেই উত্তরাখণ্ড যেখানে মঙ্গোলীয় চেহারা হওয়ার কারণে একটি ছেলেকে পিটিয়ে মারা হয়েছে এই সেদিন। যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন দীপক মহম্মদ তার সবটুকু মোহাব্বত দিয়ে। দীপকের নিজের কথা খুব স্পষ্ট। আমি থাকি বা না থাকি, মানবতা বেঁচে থাকবে। কম বয়সে পিতৃহারা দীপককে বড় করেছেন তার মা। সাথে আছেন স্ত্রী এবং ছোট মেয়ে। উদ্যত হিংসার কারণে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত কিন্তু তিনি মনে করেন যে ভয় পায় তার হৃদয়ে শক্তি নেই। 'বাবা' দোকানের মালিক পক্ষও বলেছেন তারা দোকানের নাম বদলাবেন না। তাদের পাশে এখন অনেক মানুষ আছেন।

দীপকের মত আশ্চর্য মানুষেরাই কোনো প্রচার, কোনো প্রশংসা কোনো পুরস্কারের তোয়াক্কা না করে যাবতীয় উৎপীড়ন ও সম্ভাব্য লাঞ্ছনার মধ্যে নিজের আদর্শকে তুলে ধরেন। ঠিক যেমন আমরা

দেখেছি আটাত্তর বছর বয়সী আই আই টির প্রাক্তন অধ্যাপক পদার্থবিদ বিপিন ত্রিপাঠীকে যিনি পথে পথে সম্প্রীতি ও মানবতার লিফলেট বিলিয়ে চলেন। যেখানেই মানুষ আক্রান্ত সেখানেই ছুটে যান, পাশে দাঁড়ান। যে মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাস রাখেন তাই নিয়ে অকুতোভয়ে কথা বলেন, শত চোখরাঙানির সামনে কখনো কুঁকড়ে যান না।

এই অবরুদ্ধ সময়ে দিনে দিনে বহু মানুষ মেনে নিয়েছেন এর কোনো বিকল্প নেই। এই বিপর্যয় কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না। এই চূড়ান্ত হতাশা এবং নেতিবাচক সময়ের মধ্যে দীপকের মত সাধারণ মানুষই আলো নিয়ে আসেন। ফেসবুকের পাতা থেকে নেমে অসম্ভব লড়াইয়ে মুখোমুখি হন। একটি দীপক থেকে সহস্র দীপক জ্বলে উঠুক। আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি সেই তিনটি বুলেটবিদ্ধ মানুষটির মত আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন। অথবা রবীন্দ্রনাথ, এক দেহে লীন ভারতবর্ষ।

উমর আমাদের অনুপ্রেরণা : উমর আমাদের সাথে আছে

বিশেষ সংবাদদাতা : সম্প্রতি দিল্লীর প্রেস ক্লাবে 'উমর খালিদ এ্যান্ড হিস ওয়ার্ল্ড ' বইটি প্রকাশিত হলো। এই বইটি প্রকাশনার সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছেন উমর খালিদের সহপাঠীরা, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা একসাথে পড়েছে, লড়াই করেছে, মিছিল করেছে, প্রশাসন ও হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ- এর বিরুদ্ধে হাতে হাত ধরে ব্যারিকেড তৈরি করেছে, উমর গ্রেপ্তার হবার পর জেলের ভেতর উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছে, উমর ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে , সেই কমরেডরা।

এই বইটিতে উমরের লেখা, উমরের ওপর লেখার একটি সংকলন। এই বইটি হয়ে রইলো ভারতের ইতিহাসের গৌরবজ্জ্বল এক অধ্যায়ের তথ্য ভান্ডার। এতে থেকে গেলো স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা, শাহিনবাদের মহিলাদের লড়াইয়ের কথা। বর্তমান ভারতে সবচেয়ে আক্রান্ত মুসলিম মহিলাদের রাস্তা দখলের বর্ণনা আর তাৎপর্য। রয়ে গেলো কৃষকদের লড়াইয়ের কথা। এই সব অহিংস আন্দোলনের প্রভাবে উমর খালিদদের অহিংস লড়াই। সংবিধান রক্ষার লড়াই। লিখিত থাকলো স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে অন্ধকার, সবচেয়ে নৃশংস, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বিষবাস্পে নিশ্বাস রোধকারী এক অধ্যায়ের কথা।

রাষ্ট্রের নৃশংস আক্রমণের কথা রয়ে গেলো এই বইয়ের লেখায়। উমর আর সহ বন্দীরা বিনা বিচারে পাঁচ বছরের বেশী কারারুদ্ধ করে রাখার অন্যতম কারণ তাদের মুসলিম ধর্ম, এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক বিজ্ঞাপনের উপর ঘৃণা আর বিদ্বেষের নাৎসী করাল ছায়াকে চিহ্নিত করেছে এই বই। কিছু প্রাণবন্ত, দরদী, শিক্ষিত যুবক জেলের অন্ধকারে বছরের পর বছর নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করছে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চতম আদালতের সম্পূর্ণ বিচার হীনতায়, সরকারের নৃশংসতায় আর সমস্ত রকমের মানুষের একদম নিস্পৃহ নীরবতায় ,গভীর হতাশার কথা দুঃখের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এই বইটিতে। তবু এই অন্ধকার একদিন দুর হবেই উমরের মা, বন্ধুরা, প্রিয়জনরা,সভায় উপস্থিতজনরা এই বিশ্বাসের কথা শুনিয়েছে।

এখনো যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাঁরা জানিয়েছে, উমরকে গ্রেফতার করে সরকার আমাদের এই বার্তা দিতে চেয়েছিল যে যদি ছাত্র হও, মুসলিম হও, দলিত হও, তবে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে উমরের মতন কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু হয়েছে বিপরীত জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ও প্রশাসনিক প্রতিদিনের আক্রমনের বিরুদ্ধে উমর আমাদের অনুপ্রেরণা। উমর প্রতি মূহূর্তে আমাদের সাথে আছে।

বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি

বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির পথ পরিক্রমা

মজিবুর রহমান

জাতিসত্তা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা। বাংলা ভাষা ছাড়া বাঙালি জাতি আর বাঙালি জাতি ছাড়া বাংলা ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি একসূত্রে গাঁথা। দুটিই একই পথের পথিক।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বাংলা ভাষার জন্ম বিশ্বের বৃহত্তম ভাষা পরিবারে। এই ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলো হলো ইংরেজি, স্পেনীয়, রুশ, ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ, ল্যাটিন, গ্রিক প্রভৃতি। এই ভাষা পরিবারের বৃহত্তম উপ-পরিবারটি হলো ইন্দো-ইরানীয় যার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত, ফার্সি, পশতু, কুর্দিশ, বালুচি প্রভৃতি ভাষা। এই উপ-পরিবারের প্রধান শাখা হল ইন্দো-আর্য। এই শাখাটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলো বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাগুলো প্রাকৃত ভাষা হিসেবে পরিচিত। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ হলো প্রকৃতিজাত, স্বাভাবিক বা সাধারণ। যা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তাকে সহজ ও সরল হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিল পণ্ডিত বা উচ্চ শ্রেণীর ভাষা আর প্রাকৃত ছিল সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা। আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী প্রাকৃত ভাষাগুলোর চারটি ধারা ছিল—১. মাগধী, ২. মহারাষ্ট্রীয়, ৩. শৌরসেনী ও ৪. পৈশাচি। মগধ অর্থাৎ বর্তমান বিহার ও পূর্ব ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলো মাগধী প্রাকৃত হিসেবে পরিচিত। বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের শেষ স্তরটিকে বলা হয় অপভ্রংশ। 'অপভ্রংশ' শব্দের অর্থ হলো বিচ্যুত, বিকৃত বা অশুদ্ধ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ রূপটি প্রচলিত ছিল। এই অপভ্রংশ থেকেই বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলা ভাষায় মোট শব্দের সংখ্যা প্রায় এক লাখ বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত তৎসম শব্দ হলো প্রায় ৪০ হাজার। সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় আসা অর্ধ-তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হওয়া তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। ইন্দো-আর্য ভাষার আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছ থেকে আগত দেশি শব্দের সংখ্যাও প্রায় ১৬ হাজার। ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, তুর্কি, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত বিদেশি শব্দের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। মূলত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপের ভিত্তিতে বাংলা ভাষা সাধু ও চলিত-- এই দুই ভাগে বিভক্ত।

অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষা পাঁচটি প্রধান উপভাষায় বিভক্ত। যেমন, ১. রাঢ়ী (পশ্চিমবঙ্গ-- কলকাতা, নদীয়া, হাওড়া, বর্ধমান), ২. বঙ্গালী (পূর্ববঙ্গ-- ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী), ৩. বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গ-- রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, মালদহ), ৪. ঝাড়খণ্ডী (পশ্চিম সীমান্ত-- মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) ও ৫. কামরূপী (উত্তর-পূর্ব-- কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম)। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বরাক উপত্যকা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঙালিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাসী হিসেবে বসবাস করে। বাংলা বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম মাতৃভাষা। বাংলাদেশের ১৮ কোটি ও ভারতের ১১ কোটি সহ প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভারত সরকার কর্তৃক ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষা বিকাশের প্রধান পর্যায় ৩টি, যথা-- ১. প্রাচীন যুগ (৬৫০--১২০০ খ্রিস্টাব্দ), ২. মধ্যযুগ (১২০১/১৩৫০--১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ৩. আধুনিক যুগ (১৮০১--বর্তমান)। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'চর্যাপদ' হলো বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই চর্যাগীতিকোষগুলি হলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত। এই সাধন সঙ্গীতগুলো ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। চর্যাপদের ভাষাকে 'আলো-আঁধারি' ভাষা বলা হয়।

১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আদি মধ্যযুগ বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে পরিচিত। বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের প্রেক্ষাপটে চরম অস্থিরতার কারণে ওই দেড়শ বছর কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারেনি। ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত অন্ত মধ্যযুগে দেবদেবীকেন্দ্রিক ও আধ্যাত্মিক সাহিত্য রচিত হয়। এই সময়ের সাহিত্যধারাগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। মধ্যযুগের এই সাহিত্য ছিল মূলত কাব্যিক বা ছান্দিক এবং গদ্যের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে।

আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত হন। মুখ্যত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্য ও নাট্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস সাহিত্যে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেন। রবীন্দ্র-উত্তর কালে নতুন ধারার সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। জাতীয়তাবাদী চেতনা, নানান সামাজিক ইস্যু ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের মূল উপজীব্য।

ধারণা করা হয় যে, 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে প্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের একাধিক শিলালিপিতে এই ভূখণ্ডকে 'বাঙ্গালাদেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীতকালে উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্র' এবং মালদহ 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিল।

বাঙালি আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত একটি প্রাচীন সংকর জাতি। হাজার বছর ধরে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পরিচয় গড়ে তুলেছে। বাংলা ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের

মাধ্যম নয়, বরং এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। উপমহাদেশে বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত গোটা বিশ্বেই বিরল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এবং ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচরে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে যে প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অমর একুশের সৌজন্যেই ২০০০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস চালু হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ বাঙালি ইসলামের অনুসারী এবং ২৫ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ আর ভারতের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ৩০ শতাংশ মুসলমান। মুসলিমদের মধ্যে সুন্নি এবং হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত-- বাঙাল ও ঘটি। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা পরিবারগুলো বাঙাল আর পশ্চিমবঙ্গের আদি নিবাসীরা ঘটি হিসেবে পরিচিত।

শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বাংলা ও বাঙালির যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সাফল্য রয়েছে। ভারতীয় ও বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে বাঙালি জাতির অবদান অস্বীকার করা যায় না।চুম্বকে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। রাজা রামমোহন রায় ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ তথা আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে স্বীকৃত। নারী শিক্ষার প্রসারে ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ভূমিকা পালন করেন তা খুব কম সংখ্যক ভারতীয় করতে পেরেছেন। প্রথম এশীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার জেতাই শুধু নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম ও পাণ্ডিত্য আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে। স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমাজ ভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে একজন কালজয়ী পুরুষ হয়ে রয়েছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু , আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ,সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জিতেছেন। অমর্ত্য সেন, মুহাম্মদ ইউনূস, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নোবেলজয়ী বাঙালিরা জ্ঞানের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছেন। নোবেলজয়ী মাদার টেরেসার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা।

বাঙালিরাই প্রথম উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করার মন্ত্র শিখিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ও সবচেয়ে বেশি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন বাঙালি বিপ্লবীরাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালি নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলা ভাষা ও বাঙালির পথ পরিক্রমা অবশ্য সবসময় মসৃণ হয়নি। ব্রিটিশ ভারতে বাংলাকে ১৯০৫ ও ১৯৪৭ সালে-- দুবার ভাগ করা হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালে রদ হলেও ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বাঙালিরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালিদের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। কয়েক লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ অর্জিত হয়। ভারতে বাংলা ভাষাকে হিন্দির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। আসাম থেকে বাঙালিদের উৎখাত করার পুরনো ষড়যন্ত্র আজও চলছে। মহারাষ্ট্রে বাঙালিদের ওপর কয়েক দফা আক্রমণ করা হয়েছে। সম্প্রতি বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হচ্ছেন। এমনকি কলকাতাতেও হিন্দিভাষীদের কাছে বাংলাভাষীরা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। এদেশের বাঙালিদের ‘বাংলাদেশী’ বলে দেগে দেওয়ার নতুন অসুখ সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আখ্যান।

বাঙালিকে তার জাতিসত্তার মর্যাদা ধরে রাখতে হবে। মাতৃভাষাকে ব্রাত্য করে একাজ কখনও সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করা দরকার। ইংরেজি শিখতে হবে কিন্তু তা যেন বাংলার বিনিময়ে না হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষায় এরাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে যা দক্ষিণ ভারতের দলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেকোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎপদতা ভারতে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করবে। শত সমস্যা ও সংকটকে জয় করাই হবে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির লক্ষ্য। সেই শক্তি রয়েছেও।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

একুশে ফেব্রুয়ারির সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালির ভাবনা

নীতীশ বিশ্বাস

পূর্ব বাংলায় বা আজকের বাংলাদেশে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির মহান অবদান বাঙালি জাতিকে ১৯৪৭-এর ধর্মীয় বিভাজনের উপরে উঠে এক মানবিক সংগ্রামের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। যা সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির এক সৌভাগ্যময় উত্তরণ। কিন্তু বহু আত্মত্যাগ এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করার পরেও পাক পন্থী ইসলামিক মৌলবাদের চক্রান্ত বন্ধ থাকেনি। ১৯৭১এ বাংলাদেশে তাদের

পররাষ্ট্র নীতির পরাজয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মেনে নেয়নি।

স্বাধীন দেশে বিজয় সত্ত্বেও শাসক দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য বাংলাদেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর একাংশ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে তাঁর বাসভবনে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।চার জাতীয় নেতাকেও ঢাকা জেলে হত্যা করা হয়।

এর পর খন্দকার মুশতাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট করে লে.জে. জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন।পরে তিনি জেনারেল হন ও অবশেষে খন্দকার মুশতাক কে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট হন। তথাকথিত অর্ডিন্যান্স জারি করে এই মর্মে আইন করেন যে পরবর্তী ৩০ বছর বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যার কোনও বিচার করা যাবেনা। জিয়াউর রহমান প্রহসনমূলক হ্যাঁ ভোট ও না ভোট করেন। ১৯৭৭ সালে ক্যান্টনমেন্ট - এর মধ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেন।তারপর সামরিক শাসনের অধীনে সরাসরি রাষ্ট্রপতি পদে ভোট করে নিজেই রাষ্ট্রপতি হন।

তার এইসব কাজে ১৯৭২ সালে সংসদে গৃহীত সংবিধানের কোনও অনুমোদন ছিলো না।জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হন। ক্ষমতায় আসেন হুসেন মহম্মদ এরশাদ।তিনিও ক্ষমতায় এসে সামরিক শাসন জারি করেন।১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন। তারপর ১০ বছর গণতন্ত্রের দাবিতে তীব্র আন্দোলনের পর এরশাদ ক্ষমতা ত্যাগ করেন।

শেখ হাসিনা ১৯৯২ সালের নির্বাচনে বি.এন.পি - জামাত জোটের কাছে নির্বাচনে পরাস্ত হন।কিন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লিগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জয়ী হয়। তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ‘ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবেনা ‘ এই কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স বাতিল করেন। শুধু তাই নয় ১৯৭১ এর যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। কিন্তু তিনি ২০০১ এর নির্বাচনে বিএনপি- জামাত জোটের কাছে পরাস্ত হন। ওই সরকারকে বলা হত খালেদা - নিজামী জোট সরকার। এই সরকারের আমলে হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামি লিগ কর্মীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার হয়।সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আব্দুল গফফার চৌধুরী বলেছিলেন পাকিস্তান আমলেও এই অত্যাচার হয়নি। বারংবার শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের চেষ্টা, ছায়ানট ও উদীচীর ওপর গ্রেনেড আক্রমণ, ব্লগার হত্যা এই আমলের শাসনের বৈশিষ্ট। তীব্র গণ সংগ্রামের পর ২০০৯ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লিগ বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়ে শেখ হাসিনা আবার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন মেনে ট্রাইবুনাল গঠন করে যারা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অপরাধী, যারা পাক সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের সহযোগী তাদের বিচার করান। বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকারীদেরও বিচার হয়। অনেকে অবশ্য বিদেশে পালিয়ে যায়। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও জামাত জোট ভোট বয়কট করে। দেশে বিদেশে প্রচারিত হয় যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই।

২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়। মাথাপিছু আয় ও মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পায়, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পায়, কৃষি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পায়।অর্থনীতির অগ্রগতির ফলে বাজারে অর্থের জোগান বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লিগের বিরাট সংখ্যক নেতা ও কর্মী অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরে। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগের শাসনকে স্বৈরশাসন বলে মনে করতে থাকে।অবশেষে এই শাসনের অবসান ঘটে ২০২৪ এর ৫ আগষ্ট। শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের পেছনে ছিলো কোটার নামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-যুব আন্দোলন। যা বাংলাদেশের মানুষকে এক জোর নাড়া দিয়েছিলো। এর পেছনে দুটি প্রবণতা কাজ করেছে, যার একটি হল হাসিনা সরকারের অধীনে বিগত দুটি নির্বাচন প্রহসনে রূপ নেওয়া ও তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এর জন্য যারা হতাশ ছিলেন এই আন্দোলন তাদেরকে যেনো একটা আলোর দিশা দেখিয়েছিলো। যদিও তা যে মরীচিকার আলো তা বুঝতে সময় লাগে,যখন এর পেছনে সাম্রাজ্যবাদী কলকাঠির খবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে ড. ইউনিসের নিজের স্বীকারোক্তিতে। তিনি বলেছিলেন এটা মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড প্রোজেক্ট। যা আসলে হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ডীপস্টেট ভাবনা। যাদের কাছে শেখ হাসিনা মাথা নত করেনি তারা তাকে উৎখাতের মেটিকুলাস ডিজাইনের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত করেছিল। তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় ও বাংলাদেশে দক্ষিণ পন্থীশক্তি বৃদ্ধি হয় ও পাকিস্তান পন্থী রাজাকার আলবদরেরা সামনে এসে যায়। ফলে বাংলাদেশের একুশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিবর্তে তালিবানী ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় ধর্মান্ধ একটি পরিবেশ রচনা করে। এই নির্বাচনে সেই পাকিস্তান পন্থীদের চক্রান্ত ছিলো বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানে রূপান্তর করা। যাদের শ্লোগান ছিল ভারত বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী। তারাই এই নির্বাচনে জামাতি ইসলামী পার্টির নেতৃত্বে ১১দলের প্রধান বিরোধী জোট হিসেবে ৭৭টি আসন লাভ করে। যার মধ্যে এন সিপি (বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জোটের দল) পেয়েছে ৬টি আসন। তবে মন্দের ভালো ২০২৬ এর জাতীয় নির্বাচনে ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্যে ঋদ্ধ বাংলাদেশের অধিকাংশ

মানুষ শেষ পর্যন্ত বিপুল ভোট দিয়ে জিয়াউর রহমানের পার্টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ২৯৯ এর মধ্যে (২০৯+৩= ২১২) ২১২আসন দিয়ে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা বলতে চাই জামায়েত জোটকে পরাজিত করে আপাত ভাবে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে অনেকটা রক্ষা করেছে বিএনপির জয়। তাদের নেতা জনাব তারেক রহমান ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। সঙ্গে অর্ধশত মন্ত্রী। এই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হবে একটা নতুন আবেশে। ধীরেন্দ্র নাথ দত্তর পাকিস্তান পার্লামেন্টের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ১৯৫২-র ২১শের ভাষা আন্দোলনের মহান ঐতিহ্য আর ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চেতনার কথাও স্মরণে রাখবে। সঙ্গে ২০২৪এর আন্দোলন,তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে সামনে আসবে। বাংলাদেশের আজকের অনেকটা স্বস্তির এই সমকালে আমরা ভারতের বাঙালিরা বা বাংলাভাষীরা যে প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিনত হচ্ছি। দিনে দিনে নিম্নস্রোতে ডুবে যাচ্ছি, সে বিষয়ে দুশ্চিন্তার কিছু সংলাপ এখানে উচ্চারণ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যা এই ২৬শের একুশের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষারই শপথ বাণী।

ভারতে বাংলাভাষী আক্রান্ত; প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কথা

ভাষা ও ভাষা মাধ্যমঃ আমরা একথা বলিনা যে অন্য রাজ্যের যে সব মানুষ এই রাজ্যে কাজ কর্ম করে খান বা বসবাস করেন তাদের অন্যভাষাভাষী বলে তাড়াতে হবে। কিন্তু আমরা দাবি করি অন্য রাজ্যে বাংলাভাষীদের যে বিতাড়ন নির্যাতন ও উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বিশেষকরে অধিকাংশ বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রতিনিয়ত যে বাঙালি নির্যাতন সংগঠিত হচ্ছে; আমরা চাই তার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক স্তরে প্রতিবাদ করুন। তার দলের সাংসদেরা তা পার্লামেন্টে তুলুন। তা বাদ দিয়ে কলকাতার রাস্তায় যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ভোটের বাজার গরম করবেন না। মানুষ সব বোঝে তাদের বোকা ভাববেননা। দ্বিতীয় কথা রাজ্যের সর্বস্তরে বাংলাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ চাকুরী আজ প্রায় নিঃশেষিত। সরকারী চাকুরির ১০লক্ষ পদ শূন্য রয়েছে। তাও যে দু একটি চাকুরি হচ্ছে, সেখানে এই রাজ্যের ভাষাভাষী তথা এখানকার বোর্ডে বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছেলে মেয়েদের স্থান গৌণ। আই এ এস / আই পি এস-এরা তো সবই হিন্দি বলয়ের লোক। কারণ আই এ এস- পরীক্ষায় প্রিলিতে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দি ভাষীরা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে পারে। আসলে ভারতে এখন চলছে হিন্দি ভাষার ভয়ানক আগ্রাসন। যা ভারতের ভাষাগণ তন্ত্রকে গলাটিপে হত্যাকরছে। এমন কি তামিল সহ যে রাজ্যে তারা দ্বিভাষা বা এক ভাষা ফর্মূলা পালন করে তারা নিজ রাজ্যের জোরে তাদের ভাষাকে সবল ও শ্রীযুক্ত রাখতে পারছেন।আমরা তা চাই এই রাজ্যেও। এছাড়া এই রাজ্যের ভূগোলে অবস্থিত যে কেন্দ্রীয় সরকারের বা কেন্দ্র পোষিত প্রতিষ্ঠানে; এল আই সি- ইনসিউরেন্স, ব্যাঙ্ক, সি বি এস ই অনুমোধিত সহ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নানা সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানে যে সব চাকরি হয় তার পরীক্ষা এই রাজ্যের মুখ্য ভাষায় নিতে হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা খুবই বেদনার। আমরা এই বেদনার অবসান চাই।বাংলায় বাংলা ভাষীর যথার্থ অধিকার চাই। শিক্ষাঃ রাজ্যের বাংলা মাধ্যমের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার স্কুল কিছুদিন হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো হিন্দি বা উর্দু স্কুল বন্ধ হবার কোনো খবর আমাদের কাছে নেই। আর এতো দিনের ঐতিহ্যপূর্ণ সব বিখ্যাত বাংলা স্কুল দিনে দিনে অর্থ বরাদ্দ থেকে শিক্ষক নিয়োগের রক্তশূণ্যতায় শেষ হবার পথে। জেলার ক্ষেত্রে এ চিত্র সামান্য ভিন্ন হলেও শহর ও শহর তলীর স্কুল গুলির চিত্র ভয়ানক খারাপ। রাজ্যে চাকরি নেই বলে কলেজে কলেজে গত বছর গুলির তুলনায় ২৮/৩০ ও ভর্তি হচ্ছে না। ছেলে মেয়েরা চাকরীর আশা ছেড়ে সামান্য ডোলের লাইনে মাথা খুঁড়ছে। তাই উচ্চশিক্ষায় আর ছাত্র হচ্ছে না। রবীন্দ্র নাথের বাংলায় এ এক ভয়ানক চিত্র,। জন বিন্যাসঃ এক কালে ভারতের রাজধানী ছিলো কলকাতা সে জন্যে জীবন ও জীবিকার খোঁজে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির লোক এ রাজ্যে এসেছিলেন সেই ব্রিটিশ যুগ থেকেই। কিন্তু স্বাধীন হবার আগে থেকেই বিদ্রোহের ও বিপ্লবের কেন্দ্র বিন্দু বাংলাকে দুর্বল করার জন্যে ইংরেজ শাসক যেমন রাজধানী দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল, তেমনি স্বাধীনতার পরেও ব্রিটিশের সঙ্গে সুসম্পর্কের সরকার তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাকে নানা দিক থেকেই অন্যায় ও অবিচারের শিকার করে তুলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি কোনো দিনই মারাঠী বা হিন্দু স্থানীদের মতো অন্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। তাই দিনে দিনে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পাল্টাতে থাকে। আজ এখানে ভাষা প্রাধান্যের ধারা এমন জায়গায় উপনীত যে কোনো পৌরসভা ও পৌর নিগমে আর বাঙালির জন- আধিক্য নেই। বাংলা গবেষণা কেন্দ্র, গুরুচণ্ডালির সমীক্ষক দল কিছু তথ্য দিয়েছেন যেমন তারা ভোটার লিস্ট থেকে বাঙালি খুঁজে বার করেছেন। দাস, ঘোষ, ব্যানার্জি -বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি প্রভৃতি বানানের নানারকম রকম ফেরও ধরা হয়েছে। এবার কিছু কিছু পদবী, ধরুন গুপ্ত বা গুপ্তা, বাঙালিও হতে পারে বা অবাঙালি, তাদের বাঙালি ধরে নেওয়া হয়েছে। মুসলমান বাঙালিরও কিছু নামের প্যাটার্ন ধরা হয়েছে, যেমন

ধরুন হক, কাজি, শেখ ইত্যাদি। এরা বাঙালি হবেন, এর কোনো গ্যারান্টি নেই। ফলে বাঙালির সংখ্যা যা বলা হয়েছে, তার চেয়েও কম হতে পারে। সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে। এই পদ্ধতিতে যে বিশদ ফলাফলটা তারা পেয়েছেন সেটা এইরকমঃ বিধান নগর নামক একটি কেন্দ্রে ২০০২ এর সম্পূর্ণ ভোটার সংখ্যা স্ক্যানডঃ ১৭৯,৮৯৬ বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান নামের সংখ্যাঃ ১১৩,০১৩ ২০২৫ এর সম্পূর্ণ ভোটার সংখ্যা স্ক্যানডঃ ২২১,৬৫৬ ; বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান নামের সংখ্যাঃ ১২৭,৪৪৯ । ফলে কলকাতা সন্নিহিত একটা কেন্দ্রে, জনবিন্যাস বদলের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটা হল এইঃ গত ২৩ বছরে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ ২৩% । এর মধ্যে অবাঙালি ১৫% এবং বাঙালি ৮%। ফলে, এই বিধাননগর এলাকায় যে জনবিস্ফোরণ ঘটেছে; সেটা মূলত অবাঙালি জনবিস্ফোরণ। যৌক্তিক অনুমান, ভিন রাজ্য থেকে আগতদের কারণেই। জনবিন্যাস বদল বলতে এই ই। জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সাফল্য সত্ত্বেও জনসংখ্যা যে বেড়ে চলেছে, তার মুখ্য কারণ এইটাই, অন্তত এই কেন্দ্রে। কলকাতা এবং সন্নিহিত এলাকা সুষম বলে ধরে নিলে বাকি এলাকার ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবার কথা।

উপসংহার; বর্তমানের কেন্দ্রীয় শাসক দল বাংলা ভোট এলে একটু চেপে কথা বললেও তারা যে আদ্যান্ত বাঙালি বিরোধী দল তা তাদের গুরু আর এস এস-এর ইতিহাসের দিকে তাকালেই বলা যায়। তারা ভারতের ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রবক্তা। হিন্দু মানে তাদের কাছে ব্রাহ্মণ। শূদ্র ও তাদের থেকে ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসল মানই তাদের প্রধানশত্রু। তারা সেবা বা জমির কাজ বা শ্রমের কাজ করবে কিন্তু কেনো তারা আম্বেদকরের সংবিধানের অধিকার চাইবে ? আর গঙ্গার এপারে তো মছলিখোর বাঙালির কেউই ব্রাহ্মণ নয়। তাই তাদের এক সমুদ্র অন্ধ বিশ্বাস আর নষ্ট রাজনীতির প্রভাবিত উগ্র বাহিনী তারা বাংলা বললেই তাকে বাংলাদেশী তথা বিদেশি চিহ্নিত করে মারধোর অত্যাচার আর উচ্ছেদ করতে চলছে। তাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী থেকে বজরং ফজরং সব উগ্রবাহিনী জার্মানির ইহুদিদের মতো ভারতে বাঙালিকে আর তার পরিচয় সূত্র বাংলা ভাষাকে নিয়ত আক্রমণ করছে। গত ৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ বিজেপি শাসিত ওড়িশার মালকান গিরিতে ২২৫টি বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারকে অগ্নিদাহনে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। পুলিশ ছিলো তারা বাড়ি থেকে তাদের কেবল পালানোর উপদেশ দিয়েছে কিন্তু রক্ষা করেনি ।কারণ এটা ছিলো তাদের গুরুর আদেশ। আরো দুর্ভাগ্যের কথা এই গ্রামের সব ভোটই পেয়েছিলেন এই শাসক দল । সারা ভারতের বিজেপি সমর্থক উদ্বাস্তু বন্ধুদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন সরণি অনুসরনের অনুরোধ করি। বাংলার রাজনৈতিক দলগুলিকে বলি আপনারা ব্যক্তি উচ্চাশা ছেড়ে সামান্য রবীন্দ্র নজরুলের অনুগামী হোন । বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষীকে রক্ষা করুন । নাহলে আপনাদেরও দুর্দিন সামনে । মহান ২১শের অর্জন আমাদের চেতনার নব জাগরণ ঘটাক;এই প্রার্থনা ।

(লেখক সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক)

ভাষা দিবস,বাংলা ,বাঙালি ও আমরা

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা একথাই আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে ভাষার প্রশ্নে মানুষ খুবই স্পর্শকাতর। যদি কখনও কোথাও কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অবমাননা ঘটে, তাহলে মানুষ সেখানে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।কি আমাদের দেশে সিংভূমে,কি আসামে,কি সুইজারল্যান্ডের একাধিক ক্যান্টনে,কি সাবেক জারশাসিতরাশিয়ার বুকে, সর্বত্র ই এই জিনিস লক্ষ্য করা গেছে।

বহু ভাষাভাষী এই সব এলাকায় যখনই কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু কোনও জনগোষ্ঠীর ভাষাগতস্বাতন্ত্র্যকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছে,মানুষ তখনই প্রতিবাদে -প্রতিরোধে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সেই উদ্বেলতার রণরণি আজও শোনা যায় বরাকের কূলে,ভল্গার তটে, কিম্বা সিংভূমের পাহাড়ের গায়ে, সুইজারল্যান্ডের রাইন-আরের তীরে,কান পাতলে। বহু মৃত্যু,বহু দুঃখ,বহু রক্তের মূল্যের বিনিময়ে সিংভূমে ও আসামে বাংলা ভাষা সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে, জারতন্ত্রের সমাধির উপরে সাবেক সোভিয়েত সংবিধানের ভিতরে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষাকে (জার্মান, ইতালি, ও ফরাসি)রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হলো যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু দেশ ভাগের পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের উগ্র উর্দু মৌলবাদীদের অবমাননা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালির ভাবাবেগকে আহত করে। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষাকে অর্থাৎ বাংলাভাষাকে অসম্মান করে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষাকে অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।এমনকী সিন্ধি , পুশতু ও বালুচ ভাষী মানুষের সংখ্যাও উর্দু ভাষীদের চেয়ে বেশি ছিলো। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান

গণপরিষদেরঞ্চসভ্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেন ।গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভাষা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সালাম ,রফিক, জব্বার,বরকত প্রমুখ ছাত্ররা শহীদ হন। এই রক্তঝরা ঘটনা থেকে জন্ম নেয় পদ্মা -মেঘনা- যমুনা পাগল করা গান 'আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,আমি কি ভুলিতে পারি ?'

১৯৫২সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো বাঙালিদের নেতৃত্বে একটি মাতৃভাষা আন্দোলন হিসেবে, সেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব আন্দোলন হিসাবে। অর্থাৎ, ইতিহাসের শিক্ষাই হলো এই যে ভাষাগত আবেগকে যথাযথ মর্যাদা না দিলে তার পরিণতিতে গোটা বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই ভেঙে চুরে নবকলেব নিতে পারে এবং এর নজির গড়েছেন বাঙালিরা, বাংলাভাষী মানুষরা।

তবুও বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির চেতনা ফিরছে না, চেতনা ফিরছে না আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহের । আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, নির্যাতন চালানো হচ্ছে বাঙালি সহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরকে।

উল্লেখ্য যে ১৯৫২সালেঞ্চ মেঘনা ধলেশ্বরী কপোতাক্ষের পাড়ে বাঙালিরা যে লড়াই করেছিলেন,তা কিন্তু শুধু বাঙালির জন্য লড়াই ছিল না। এটা ছিল গোটা বিশ্বের জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সকল মাতৃভাষা প্রেমিক মানুষদের আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খুব সঠিক ভাবেই ১৯৫২সালে বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আন্দোলন কিন্তু উর্দু ভাষীদের বিরোধী আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন যেখানে যেখানে উর্দু ভাষীরা সংখ্যালঘু, সেখানে সেখানে কিন্তু এই আন্দোলন তাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। তৎকালীন সময়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী, উর্দু ভাষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৫২সালের পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেন , পাকিস্তানের জননেতা খান আব্দুল গফুর খান, তাঁর পুত্র ওয়লি খান সকলেই একই কথা বলেন। এর জন্য তাঁদেরকে উগ্র উর্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর লোকজনদের কাছে অনেক কুকথা শুনতে হয়।

আমাদের দেশ ভারতে মোদি সরকারের রাজত্বে বাংলা, বাঙালি,ও সকল ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমাদের সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায় সকল ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।২৯নং ধারায় বলা হয়েছে "Any section of citizens ---- having a distinct language– script or culture of its own–shall have the right to conserve the same". এতদ্ সত্ত্বেও আমাদের দেশে আজ 'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান ' ধ্বনি তুলে বাঙালী সহ ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর দানবীয় অত্যাচার করে যাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও উগ্র হিন্দী মৌলবাদীরা। ভারতের শতকরা ৪৩ ভাগ লোক হিন্দিতে কথা বলে। ৫৭ ভাগ লোক অ-হিন্দী ভাষায় কথা বলে। হিন্দি অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং সকল সংস্কৃতিবান মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে এবং করা উচিত। কিন্তু মোদী সরকারের রাজত্বে উগ্র হিন্দী ও হিন্দু মৌলবাদী লোকজন দেশটাকে কোন রসাতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ?

যে বাংলা ভাষা বিশ্বের একটি সুসমৃদ্ধ ভাষা, যে ভাষা হলো নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ভাষা, জসিমুদ্দিনের ভাষা,অমর্ত্য সেনদেরঞ্চ ভাষা, সেই ভাষায় কথা বললেই তাকে বিদেশী বাংলাদেশী বলেঞ্চ অভিহিত করে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে,বাংলা ও বাংলাদেশী কিম্বা বাঙালি যে এক নয়, এইসব বিবেচনা তারা হারিয়েছে। মুসলিম হলে তো কথাই নেই,পেটাও,শেষ করে দাও সেই 'ব্যাটাকে'। হিন্দু হলেও 'নিস্তার' নেই। খেদাও আগে ওকে , তারপর পাঠাও ওকে 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' ।আসামে হাজার হাজার বাঙালি বাংলা বিদ্বেষের শিকার হয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ডিটেনশন ক্যাম্পে ভুগছেন ।এর মধ্যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই আছেন এবং মুসলিম ভাই বোনদের চেয়ে হিন্দু ভাই বোনদেরঞ্চ সংখ্যা অনেক অনেক বেশী ।সর্বোপরি একজন মানুষ যদি বিদেশী বা বাংলাদেশীও হয়, তাহলেও সে তো একজন মানুষ। সে তো জাতি পুঞ্জেরসনদের স্বীকৃত মানব অধিকারসমূহ পেতে পারে।

এক কথায় বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে, সকল শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে, তাদের সমস্ত ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, শিক্ষাগত, যাবতীয় মানব অধিকার গুলো রক্ষার জন্য দূর্বার গতিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই সময়ের দাবি।

(লেখক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী)

স্মরণ

মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)

১৯৩৩-২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়; পাঠকেক কাছে যিনি 'শংকর' নামে সমধিক পরিচিত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। গত বছরের শেষের দিকে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু এবার আর ফেরা হলো না।

হাওড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা শংকরের জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছিল কলকাতার রাজপথে কাজের খোঁজ করতে করতে। একসময় তিনি ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের ক্লার্ক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বারওয়েল সাহেবই ছিলেন তার জীবনের প্রথম 'আইকন'। নোয়েলই ছিলেন কলকাতার আদালতে নিয়োগ পাওয়া সর্বশেষ ইংরেজ আইনজীবী। তাঁর মৃত্যুর পরই শংকর কলম ধরেন এবং লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কত অজানারে'। ১৯৫৫ সালে প্রকাশের পরপরই বইটি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়। পরে 'চৌরঙ্গী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনঅরণ্য' এবং 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ'-এর মতো কয়েকটি বই প্রকাশের পরে পাঠক মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আশি বা নব্বইয়ের দশক ছাড়িয়ে আজকের ডিজিটাল যুগেও শংকরের লেখনী একইভাবে প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে পাঠকদের ভালোবাসার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। ২০০৩ সালে তিনি লাভ করেন 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'। এ ছাড়া 'বঙ্গবিভূষণ'সহ অসংখ্য ছোটবড় সম্মান পেয়েছেন তিনি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল চৌরঙ্গী, সীমাবদ্ধ এবং জনঅরণ্য। ওই তিনটি বই নিয়ে সফল চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। সীমাবদ্ধ এবং জনঅরণ্য উপন্যাস দুটি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র নির্মাণে ভিন্ন মাত্রা পায়। ২০১৬ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট সম্মানে ভূষিত হন। ২০১৯ সালে এক বছরের জন্য কলকাতার শেরিফ পদে মনোনয়ন পান। ২০২০ সালে 'একা একা একাশি' বইটির জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় শংকরের একটি বহুলপঠিত ট্রিলজি উপন্যাস, 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল'। কর্মজীবনে যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, তিনজন যুবকের চোখ দিয়ে তাই দেখিয়েছেন লেখক। উপন্যাস ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর অনেকগুলি বই আছে। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্য খুবই জনপ্রিয়। সেগুলির মধ্যে রয়েছে, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা', 'জানা দেশ অজানা কথা', 'মানবসাগর তীরে' ইত্যাদি। নানা ধরনের স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছেন তিনি। তার মধ্যে তিন খণ্ডে লেখা, 'চরণ ছুঁয়ে যাই' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

সারাজীবন কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় কাটালেও শেষ জীবনে শংকরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন। বিপুল পাঠক পেয়েছেন। কিন্তু কিছুটা নিঃসঙ্গতায়, প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে কেটেছে তাঁর শেষের কয়েকটা দিন। কিন্তু যখন উঠে বসেছেন, তখনও আড্ডা দিয়েছেন। অল্প সময়ের জন্য হলেও গিয়ে বসেছেন বসবার ঘরে। মন খুলে কথা বলেছেন। প্রাণ খুলে হেসেছেন। নতুন বইয়ের পরিকল্পনা করেছেন। বাঙালি জীবনের নানা দিক নিয়ে নিরন্তর ভেবে গিয়েছেন। তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল প্রাণশক্তি। সমকালের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল তুলনাহীন। তাঁর লেখায় এই দায়বদ্ধতাই বারবার প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি পাঠকের কাছে শংকর মানেই এক অদ্ভুত জাদুর পৃথিবী। তাঁর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'চৌরঙ্গী' কেবল একটি উপন্যাস নয়, এটি একটি যুগসন্ধিক্ষণের দলিল। গ্র্যান্ড হোটেলের আদলে গড়া 'শাহজাহান হোটেল' এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাতা বোস, মার্কো পোলো বা করবী গুহর মতো চরিত্রগুলো আজও বাঙালির রক্তে মিশে আছে। এই উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবি এবং থিয়েটার আজও সমান জনপ্রিয়। কিশোর সাহিত্যে শংকরের প্রথম পদার্পণ শারদীয়া আনন্দমেলা-তে 'পিকলুর কলকাতাভ্রমণ' নামক অণু-উপন্যাসটি দিয়ে। পরে আবার এই লেখাটির নাম পাল্টে হয় 'খারাপ লোকের খপ্পরে'। এর সঙ্গে আরও দু'টি লেখা নিয়ে 'এক ব্যাগ শংকর' নামে প্রকাশিত হয়। আবারও তুমুল জনপ্রিয়তা। 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি' 'বোধোদয়', 'এক দুই তিন', 'সার্থক জনম' 'চরণ ছুঁয়ে যাই'-এর মতো কালজয়ী সাহিত্য তাঁর হাতেই সৃষ্ট।

শংকরের বাস্তবধর্মী ও তীক্ষ্ণ লেখনি মুগ্ধ করেছিল সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত পরিচালককেও। কেবল গল্প-উপন্যাস নয়, শঙ্কর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন বিশিষ্ট গবেষক হিসেবেও। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর লেখা 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বা 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' গ্রন্থগুলো পাঠককে এক রক্ত-মাংসের স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে তাঁর মানবিক দিকগুলো শঙ্কর অত্যন্ত নিপুণভাবে সাধারণের সামনে এনেছেন।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। 'ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি', 'এআইসিসি ইকোনমিক রিভিউ, 'পিস নিউজ' এবং বাংলাদেশের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য লেখা। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী দেহদান করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

ধারাবাহিক

জরুরি অবস্থা : ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধির বিপুলভাবে জয়লাভ

সুশান্ত দাসগুপ্ত

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(১২)

১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি বিপুলভাবে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পর থেকে সাময়িক ধাক্কা সামলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির শক্তি নতুন করে আন্দোলনের চেষ্টা শুরু করে। জনতা পার্টির এই নির্বাচনে বিপর্যয় হয়। নির্বাচনের কিছুদিন পরেই জনতা পার্টি থেকে পুর্বতন জনসংঘ ও আর এস এস-এর লোকজন বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করে। স্বাধীনতার অব্যাহিত পরই উন্ন হিন্দুত্ববাদী শক্তি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি হত্যা করে। এই শক্তির ধারণা ছিল জাতির জনক নিহত হলে যে প্রচণ্ড অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। সেই সুযোগ ও তুমুল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশকে তারা একটি থিয়োক্রেটিক হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই দূরভিসন্ধি পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্যর্থ করে দেয়। সংবিধান প্রণয়কারী গণপরিষদ দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের এই জাতি রাষ্ট্রের জন্য একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করে। হতাশ হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর.এস.এস- এর সাহায্যে ভারতীয় জনসংঘ গঠন করে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই স্বাধীনতা ঝুটা বলে ঘোষণা করে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টি ওই রণনীতি ও রণকৌশল ভুল ছিল বলে স্বীকার করে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পার্টি অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার নীতি ত্যাগ না করলেও কোনওভাবেই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলায়নি। কমিউনিস্ট পার্টি একক উদ্যোগে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ১৬টি আসনে জয়লাভ করে ও শতকরা ৪ ভাগ ভোট পায়। অবিভক্ত পার্টি ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও এককভাবে লড়াই করে ও তাঁদের শক্তি সারা দেশে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। পার্টি অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার জন্য ওই সময় পর্যন্ত কখনও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস করেনি।

১৯৫২ সাল থেকেই জনসংঘ ও আর এস এস নানা বিষয় তুলে সাধারণ মানুষকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। যথা গোহত্যা নিবারণ, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা মোতাবেক স্পেশাল স্যাটাস নীতি বাতিল, পারমাণবিক বোমা বানাতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু কোনটিই তাদের খুব বেশি অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে পারেনি। ১৯৬৭ সাল থেকে তারা বিরোধী জোট করার রাস্তা গ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও সোশ্যালিস্টদের সাহায্যে তা পূর্ণতা পায়।

ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হবার পর তারা একটি চমকপ্রদ বিষয় খোঁজ করছিল, যা নিয়ে তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলবে। বিজেপি ওই সময়ে মুসলমানদের ভারতীয়করণ-এর জন্য গঙ্গাজল যাত্রার আহ্বান জানায়। বিষয়টি হল এই যে পূর্বের অরুনাচল প্রদেশের পরশুরাম কুন্ড থেকে তাম্রকলসে জল ভরে যাত্রা শুরু হবে। একইভাবে দেশের চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন নদনদীর জল, নিয়ে যাত্রা শুরু হবে। অবশেষে ওই সব জল একত্র করে এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এই যাত্রা পথে মুসলমানরা যাতে নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে সেই জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হবে। সংঘ পরিবারের এই সাম্প্রদায়িক প্রচার সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, মুসলমানরা এদেশের নাগরিক ও ভারতীয়। মুসলমানদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি করে গোলযোগ বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই হীন প্রচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে বলে ইন্দিরা গান্ধী 'চেতাবনী' দেন। সংঘ পরিবারের এই অপপ্রচেষ্টা অবশ্য মানুষের মনে কোনও রেখাপাত করেনি। সংঘ পরিবারের এই অপপ্রচেষ্টা সম্পর্কে অবশ্য দুই কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি নিশ্চুপ ছিল। সংঘ পরিবার যথারীতি এই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে স্বৈরতন্ত্রী বলে সমালোচনা করে।

সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধন

এই সময়ে আসামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল যে তারা অনুপ্রবেশকারী। বাঙালিদের বিরুদ্ধে এর আগে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে 'বাঙাল খেদা' বলে আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। আশির দশকের এই আক্রমণ ছিল আরও তীব্র ও মারাত্মক। জাতি বৈরিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলবার জন্য তীব্র বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু হয়। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে 'আসু' নামক ছাত্র সংগঠন গঠিত হয় এবং তারাই এই আন্দোলন শুরু করে ও নেতৃত্ব দেয়। এদের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল 'অসম গণ পরিষদ'। সাম্প্রদায়িক শক্তি এই আন্দোলনের সুযোগ নেয়। তারা আসামে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী বলে আখ্যা দেয় ও তাদের বিতাড়নের দাবি তোলে। প্রাণভয়ে বাঙালি মুসলমানরা জনগণনার সময়ে নিজেদের 'অসমিয়া' বলে ও মাতৃভাষা 'অসমিয়া' বলে নথিভুক্ত করে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। নওগাঁর কাছে 'নেলি' নামক স্থানে একরাতে গ্রামবাসীদের ওপর সশস্ত্র দাঙ্গাবাজেরা পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত আক্রমণ করে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই বাদ যায়নি। 'নেলির' গণহত্যা স্বাধীন ভারতে মানবতা লঙ্ঘনের এক লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক শক্তি আসামের তথাকথিত ভাষা আন্দোলনের ভিতর অনুপ্রবেশ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। (ক্রমশ)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মহাত্মা গান্ধি

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

- ৫ -

গান্ধীজি ও পি সি যোশীর পত্রালাপ

আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দেবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের অভ্যন্তরের উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ এই প্রচার অভিযানে যোগ দেয়। তাঁরা গান্ধীজির কাছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগপত্র পাঠায়। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষী প্রচার চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধীজির সঙ্গে সিপিআই-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর চিঠিপত্র আদানপ্রদান শুরু হয়। কিন্তু তাঁদের এই চিঠিপত্র বিনিময় নিয়ে এমন বিরুদ্ধবাদী প্রচার চলে, যা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক যোশী তাঁর সঙ্গে গান্ধীজির যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল, সেগুলি প্রকাশ করেন। গান্ধীজির সঙ্গে ইংরেজি ও হিন্দি এই দুই ভাষায় চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল। এগুলি বঙ্গানুবাদ করেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'গান্ধী-যোশী পত্রালাপ' শিরোনামে পুস্তিকাটি ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনালয়) থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির দাম ছিল ৪ আনা। এর ভূমিকা লেখেন পি সি যোশী। তিনি লেখেন, 'গান্ধীজির সঙ্গে আমার চিঠিপত্র প্রকাশ করতে আমি চাইনি, কিন্তু ফন্দিবাজের দল নিজেদের মতলব হাসিল করছে আর তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদে একে কাজে লাগাচ্ছে।'

ভারতীয় সংবাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র বলে 'ফোরাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকাটি ছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির (সিএসপি) মতবাদের সমর্থক। এই পত্রিকার ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখের সংখ্যায় 'পি সি যোশীর আতঙ্ক' শিরোনামে একটি সংবাদ বেরোয়। এই পত্রিকাতে 'ভারতদেবী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক অরুণাচলম লেখেন, 'তিনি সম্প্রতি সেবাগ্রামে (ওয়ার্ধা) গিয়ে একটি ঘটনা জেনে এসেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, যোশীকে গান্ধীজি চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে না পেরে যোশী নাকি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছেন ও তার থেকে আর-বেরোননি। এর ফলে সেবাগ্রামে হাসির হিল্লোল বয়ে গিয়েছে।'

উপরোক্ত সংবাদটির প্রেক্ষিতে যোশী তাঁর পুস্তিকাটিতে লিখেছেন, 'এই চিঠিপত্র যাঁরা পড়বেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের মনে আমাদের সম্বন্ধে কুসংস্কারও আছে, তাঁরাও বুঝবেন যে, 'ফোরাম' আর তার সুযোগ্য সংবাদদাতা নিছক মিথ্যাকে খবর বলে চালিয়ে থাকেন।' গ্রন্থটির ভূমিকাতে যোশী দেশের অন্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে- যথা অন্ধ্র পত্রিকা, অন্ধ্রপ্রভা, দৈনিক হিন্দুস্তান ইত্যাদিতে গান্ধীজির নাম করে কীরকম কমিউনিস্ট-বিরোধী মনগড়া সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন।

গান্ধীজি যোশীকে ১১ জুন, ১৯৪৪-এ যে চিঠিটি দেন, তাতে তিনি পাঁচটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি —

১) 'জনযুদ্ধ' কথাটিতে 'জন'-এর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে, যুদ্ধ কোটি কোটি ভারতীয় কিংবা পূর্ব, দক্ষিণ বা পশ্চিম আফ্রিকা কিংবা আমেরিকার কাফ্রিদের, কিংবা এদের সকলের স্বপক্ষেই হচ্ছে? মিত্রপক্ষ কি ওই ধরনের যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে?

২) তুমি যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, তার হিসাবপত্র কি প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষিত হয়ে থাকে? যদি হয়, তাহলে আমি কি সে হিসাব দেখতে পারি?

৩) কথা উঠেছে যে, গত দুই বছরে কমিউনিস্ট পার্টি মজদুর ধর্মঘটের নেতা আর সংগঠকদের ধরিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ সাহায্য করেছে।

৪) কমিউনিস্ট পার্টি নাকি শত্রুভাব নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ার কৌশল অবলম্বন করেছে?

৫) কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কি বিদেশ থেকে হুকুম আসার ফলে নির্ধারিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর উপরোক্ত চিঠির দীর্ঘ উত্তর দেন যোশী, ১৪ জুন, ১৯৪৪ তারিখে। তাতে তিনি গান্ধীজির প্রশ্নগুলির সবিস্তার উত্তর দেন। ওই চিঠিতে যোশি লেখেন, 'গত দু'বছরের মধ্যে আমাদের চারজন কমরেডের ফাঁসি হয়েছে (পিপলস ওয়ার, প্রথম খণ্ড, ৪০ সংখ্যাতে আপনি তাদের কাহিনি পড়তে পারেন)। প্রায় চারশো জন এখন জেলে। একশো জন কমরেড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এইভাবেই কি সরকার আমাদের সাহায্য করছে?'

গান্ধীজি ৩০ জুলাই তারিখে এর উত্তরে যোশীর বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪-এর চিঠিতে যোশী গান্ধীজিকে লেখেন, 'নয়াদিল্লির দলিল দস্তাবেজ যেদিন জাতির নিয়ন্ত্রণে আসবে, সেদিন দেখা যাবে, আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্বন্ধে সরকারের মতটা কি। কিন্তু আমি শুধু সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকছি না।' ওই চিঠিতেই যোশী লেখেন, 'সম্প্রতি কাগজের বরাদ্দ সম্বন্ধে যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে, অধিকাংশ সংবাদপত্রই তা থেকে কিছু কিছু রেহাই পেয়েছে। আমরাও সরকারের কাছে দরখাও করেছিলাম। আমি আপনাকে কয়েকটি চিঠির নকল পাঠাচ্ছি। তা থেকে বুঝবেন যে অধিকাংশ 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র ও প্রকাশক যে সুবিধা পেয়েছে, সরকার আমাদের পত্রিকা ও প্রকাশন বিভাগকে তা দেয়নি।'

১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কমরেড যোশী গান্ধীজিকে লেখেন, 'সাধারণ অবস্থায় আমাদের পার্টির সুনামের দিক থেকে যা অগ্রাহ্য, সেই ধরনের একটি প্রস্তাব আপনার কাছে করব। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু, রাজাজি (চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি) বা ভুলাভাই দেশাইয়ের মতো যে কোনও খ্যাতনামা দেশভক্ত আমাদের উভয়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। তাঁদের কাছে আপনাকে পাঠানো কমিউনিস্ট-বিরোধী কাগজপত্র দিন। এই তিনজন আপনার পুরানো সহকর্মী, ওই কাগজপত্রের একটা নকল আমাকে দেবেন। আর তাঁরা যেন যে কোনও বিষয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁদের রিপোর্ট পড়ে আপনি ওই কমিউনিস্ট-বিরোধী দলিল-দস্তাবেজে আগুন ধরিয়ে দেবেন।'

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যোশীকে বলেন, 'আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজি হয়ে তুমি নিজেকে অপমান করেছ।' যোশী তাঁকে বলেন, 'আমার দলগত অহংকার কম, আর আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের কাছে বিচার চাইতে অসম্মান নেই, বরং সম্মানই আছে।' সরোজিনী নাইডু কমিউনিস্ট-বিরোধী চিঠিপত্রগুলি পড়ে বলেছিলেন, 'অভিযোগগুলি আজগুবি।' একথা তিনি প্রকাশ্যেও বলেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন, কমিউনিস্ট-বিরোধী কাগজপত্র হারিয়ে গিয়েছে, তার জন্য তল্লাশি চলছে। তিনি দীর্ঘ ১১ মাস অপেক্ষা করেছেন, তাঁর কাছে কিছুই পৌঁছায়নি। 'কিন্তু সে প্রতীক্ষা বৃথাই করেছি।'

গান্ধীজি তার উত্তরে সব বিষয়ে একমত না হলেও কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ, সেকথাও জানান। উভয়ের মধ্যে মোট ১৪টি চিঠি আদানপ্রদান হয়। গান্ধীজির উত্তরগুলি সম্পর্কে 'গান্ধী-যোশী পত্রালাপ' পুস্তিকার ভূমিকার বিশ্লেষণ করে যোশী লিখেছেন—

'আমরা এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলি; এ বিষয়ে গান্ধীজি আমাদের মতে একেবারে সায় দেন না।... 'আমাদের হিসাবপত্র সম্বন্ধে গান্ধীজি দেখেছেন যে, আমাদের জবাব সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।'

অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি লেখেন- ' তোমার জবাব আমি বুঝেছি, তার বেশ কদরও আমি করি। আমার যদি কোনও কুসংস্কার না থাকতো, তাহলে তোমার জবাব মেনে নিতে কোনও সঙ্কোচ করতাম না। কিন্তু বাস্তবিকই আমার মুশকিল রয়েছে। আমি তোমার কাছে সহানুভূতি চাইছি।' যোশী লিখেছেন, 'আমাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই যদি বলেন, আমার কথা মেনে নেবার পথে বাধা হল তাঁর কুসংস্কার, তা হলে আমার আর কিছু বলার থাকে না।'

তাঁর শেষ চিঠিতে গান্ধীজি বলেন, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে রায় দেবার দুঃসাহস রাখি না। তিনি তাঁর চিঠিতে অন্য যে সব কমিউনিস্টদের নিজে চেনেন, যথা মোহন কুমারমঙ্গলম, বাটলিওয়ালা ও হাবিবের (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর মহমুদের ছেলে) নামও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

গান্ধীজি ওই চিঠিতে লেখেন, '...মোটের উপর আমি রাজাজির সঙ্গে একমত যে, তোমরা নিজেদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দিতে রাজি হয়ো না।' যোশী লিখেছেন, 'আসলে আমাদের মুশকিল হল এই যে, আজকাল প্রত্যেক কমিউনিস্ট তাঁর কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছ

থেকে এই রকম কথাই শুনেছে। কমিউনিস্টদের সুখ্যাতি করা ছাড়া কারও কিছু বলার নেই। অথচ বারবার বলে বলে ও অন্ধ কুসংস্কারের কল্যাণে যে কথা রটেছে, সে কথাও কেবল শোনা যাচ্ছে।'

মহাত্মা গান্ধী ও পি সি যোশীর মধ্যে যে পত্রাবলি বিনিময় হয়েছিল, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার প্রতি যে গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল, তা এই চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কমিউনিস্টদের একটি বড় অংশ এই সত্যটি বুঝতে পারেনি।

তথ্যসূত্র– (১) গান্ধী-যোশী পত্রালাপ, প্রকাশক- সেরিবান।
(২) শতবর্ষে সজীব এস এ ডাঙ্গে, দিলীপ চক্রবর্তী ও বাসুদেব গাঙ্গুলী, প্রকাশক-সপ্তাহ পাবলিকেশনস। (৩) বাবা পৃথ্বী সিং-এর ডায়েরি; রাজ্য পুস্তক পর্যদ। (৪) Indian Communist Movement by Mohit Sen.

(ক্রমশ)

নাগরিক স্মৃতিচারণা

অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্পিকার সৈয়দ নওশের আলী

(২ মার্চ ১৮৯০, ৬ এপ্রিল ১৯৭২)

অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে এক দৃঢ়চেতা, নীতিবান ও বাম-ঝোঁক সম্পন্য প্রগতিশীল নেতার নাম সৈয়দ নওশের আলী। আইনবিদ, সংসদীয় ব্যক্তিত্ব ও কৃষক-শ্রমিকমুখী রাজনীতির এক আপসহীন কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।

১৮৯০ সালের ২ মার্চ নড়াইল জেলার মির্জাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে শেষ করে খুলনার দৌলতপুর হাইস্কুল (বর্তমান সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়) থেকে ১৯০৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাস করেন। দৌলতপুর কলেজ (পরবর্তী বি.এল. কলেজ) থেকে আর্টসে অধ্যয়ন শেষে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯২১ সালে কলকাতা হাইকোর্ট-এ আইন পেশা শুরু করেন এবং ১৯৫২ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট-এর সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর মাধ্যমে। ১৯২৭ সালে যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হন। পরবর্তীতে তিনি কৃষক প্রজা পার্টি-তে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্য হন।

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ-কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তিনি স্থানীয় সরকার ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা ছিল; তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৯৪১ সালে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কারাবরণ করেন এবং একই সময়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু-এর আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৩ সালের ১ মার্চ তিনি প্রগতিশীল কোয়ালিশন পার্টির প্রার্থী হিসেবে আইনসভার স্পিকার নির্বাচিত হন; অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্পিকার হিসেবে ২৪ এপ্রিল ১৯৪৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকার থাকাকালে সংসদীয় রীতিনীতি ও আইনের শাসন রক্ষায় তাঁর দৃঢ়তা ছিল অনুকরণীয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তিনি কলকাতায় থেকে যান। ১৯৫২ সালে ভারতের রাজ্যসভায় মনোনীত হন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু-এর সরকারের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'Preventive Detention Act'-এর বিরোধিতা করে সংসদে দৃঢ় অবস্থান নেন। এর ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৭ সালে দলীয় সম্পর্কের অবসান ঘটে।

পরবর্তীতে তিনি কমিউনিস্ট সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৫৭,১৯৬১) এবং পুনরায় ১৯৬২,১৯৬৮ পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল ঢাকার পিজি হাসপাতালে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

নীতির প্রশ্নে আপসহীন এই রাজনীতিবিদ সবসময় বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি প্রখ্যাত বাম রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনো-এর মাতামহ।

সৈয়দ নওশের আলী আমাদের ইতিহাসে এক আলোকবর্তিকা; সংসদীয় গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও প্রগতিশীল রাজনীতির এক উজ্জ্বল নাম।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি তাঁকে। (fb থেকে)

বন্ধুতার পাতা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

পবিত্র রমজান মাসে
মুসলমান সম্প্রদায়ের
মানুষেরা সকাল থেকে
সন্ধ্যে পর্যন্ত রোজার
উপবাস রাখছেন।
তারই মধ্যে হিন্দু প্রতিবেশীর
মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে
শ্মশান যাত্রী হলেন মুসলমান
গ্রামবাসীরা।
উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের
পানশিলা গ্রামের বাসিন্দা
বাসুদেব নন্দী। শনিবার
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ
তার মৃত্যু হয়। গ্রামের মুসলমান
বাসিন্দাদের সহযোগিতায়
শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
দত্তপুকুরের পানশিলা গ্রামে
দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরেই মুসলমান
ও হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের
মানুষ মিলে মিশে
বসবাস করে। যে কোনও
বিপদে আপদে তারা একে
অন্যের পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাসুদেবের মৃত্যুর পরে তারা
একে অন্যের পাশে এসে
দাঁড়ায়। রবিউল্লাহ সর্দার,
মঞ্জুর শেখ, আলাউদ্দিন
আলিরা
গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে কাঁধ
মিলিয়ে মুসলমানরা
মৃতদেহ নিয়ে শ্মশান
যাত্রী হয়, কোটরা পঞ্চায়েত
প্রধান রবিউল্লাহ সর্দার
বলেন — বাসুদেব নন্দী
এলাকার দীর্ঘদিনের
বাসিন্দা, উনি অসুস্থ
থাকাকালীন গ্রামের
মুসলমান ভায়েরা

২

হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন, তিনি মারা যাবার পরে মানবিকতার টানে হিন্দুদের সাথে আমরা শ্মশানে যাবায় সাক্ষী হয়েছি।।

এই সময়, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আনন্দবাজার পত্রিকা 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগ

পত্রিকা: রাবণ, জানুয়ারি ২০২৫
সম্পাদিকা সোমাইয়া আখতার
লেখিকা: অনিতা অগ্নিহোত্রী, স্বপ্না দেব, মামদুন নিহার।

পত্রিকা: প্রাতিস্বিক বইমেলা ২০২৫ সংখ্যা
প্রমথ চৌধুরী ও সতীনাথ ভাদুড়ীকে নিয়ে লিখেছেন সৈয়দ কওসর জামাল।

পত্রিকা: সঙ্গীত মনন, সঙ্গীতে নারী, নারীর সঙ্গীত
সম্পাদক: ইমতিয়াজ আহমেদ।
লেখিকা লীনা চাকি, রাগিনী সিদ্ধান্ত।।

বই
নর্থক্যালকাটা: সোল অফ হেরিটেজ।
১০ জন আলোক চিত্রীদের তোলা আলোকচিত্র। বিষয়ের মধ্যে একটি — জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই শহরের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপ।।

পাকিস্তানের কিংবদন্তী ক্রিকেট খেলোয়াড়, প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান খান। তার শরীরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতের দুই বিখ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কার ও কপিল দেব। এদের সাথে রয়েছে ৫ টি দেশের ১৪ জন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক।
আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৮/২/২৫

ওঁ

অসুস্থতার কারণে
হাসপাতালে ভর্তি
বিখ্যাত অভিনেতা ও
চিত্রনাট্যকার সেলিম খান॥
সেলিমের হাসপাতালে ভর্তি
হবার খবর পেয়ে তার
সঙ্গে দেখা করতে যান
হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্যকার
জাভেদ আখতার, অভিনেতা
রনবীর সিংহ, অভিনেত্রী
মালাইকা অরোরা॥

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩/২/২৫

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ
কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন
তাওসেফ
ইসলাম। তাকে
নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন
পরিচালক কবীর খান।
তওসেফের চরিত্রে অভিনয়
করবেন কার্তিক আরিয়ান॥

আনন্দবাজার
পত্রিকা,
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭/২/২৫

কুম্ভ মেলায় ঘুরতে
যাওয়ার সময়ে বাড়িতে
চুরির ভয়ে ১৫ লক্ষ
টাকার সোনার গয়না
একটা পুরনো বাক্সে
ভরে আবর্জনার বস্তার
ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন
হরিয়ানার ফরিদাবাদের
বাসিন্দা অশোক শর্মা।
ঘরে আসার পর কিছুটি
তার মনে ছিল না।
১০ মাস বাদে দীপাবলির
আগে ঘর পরিষ্কার করার
সময় গয়না সহ আবর্জনার
বস্তাটি পুরনো জিনিস
কেনাবেচা করা হাজি আখতার
খানের কাছে বিক্রি করে দেন।
দীপাবলীতে গয়না খুঁজতে
গিয়ে টনক নড়ে, আখতারের
গুদামে ছুটে যান, কিন্তু
খুঁজে পাওয়া যায়নি।
বেশ কয়েক মাস পরে জঞ্জাল
পরিষ্কার করতে গিয়ে
আখতারের চোখে পড়ে
গয়নার বাকসটি। তিনি
অশোককে ফিরিয়ে দেন॥

৪

পাকিস্তান ও ভারতের
ক্রিকেট খেলা / কলম্বো //
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ /
টিভি প্রদর্শনীর সময়
ভারতের রোহিত শর্মার
সঙ্গে হাত মেলালেন
পাকিস্তানের ওয়াসিম
আকরাম //
টিভিতে প্রাক-ম্যাচ
আলোচনার জন্য মাঠে
নেমে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে
দুজনকে অনেকক্ষণ কথা
বলতে দেখা গেল //
যেন ছবির পর্দায় ঝড়
তোলা পুরনো সেই 'প্যার
আপনো ওয়াস্তে' জুটি //
ধারাভাষ্যে বিরতির ফাঁকে
দুজনে দেখা হচ্ছে আড্ডা
দিতে থাকলেন।
সুনীল গাভাস্কারের পাশে
দাঁড়িয়ে দিব্যি ক্রিকেট
আলোচনায় মেতে উঠলেন
ওয়াকার ইউনিস।

খেলে থাকা বোলিং ভঙ্গীর
জন্য যাকে নিয়ে ঝড় বয়ে
যাচ্ছে সেই উসমান তারিক
হরভজন সিংকে দেখতে
পেয়ে দূর থেকে সেলাম
ঠুকলেন //
হরভজন পরে জানালেন
দুবাইয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে
গিয়ে তারিকের সঙ্গে
পরিচয় হয়েছিল। তাই
তাকে দেখতে পেলে ও রকম
সেলামের ভঙ্গী //
মিসবা-উল-হকের পাশে
দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ টিভি
আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন
হরভজন সিং // যখনই
বিরতি হচ্ছিল, দুজনে গভীর
ক্রিকেট আড্ডায় মেতে
উঠছিলেন //
মিসবা-উল-হককে দেখতে
পেয়েই এগিয়ে গেলেন রবি
শাস্ত্রী।
আরে কেমন আছো ?
তারপর দুজনের কথা শুরু
হলো //